

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

سورة الصافات (সূরা আস সাফফাত)

৯০. متى نزلت سورة الصافات وكم آية فيها؟ [সূরা আস সাফফাত কখন নাযিল হয়েছে এবং এতে কত আয়াত রয়েছে?]

৯১. الواء في قوله تعالى "والصافات صفا" للقسم، فما جواب القسم وما باء واو-قسم-এর মধ্যে-والصافات صفا বাগী মহান আল্লাহর বাগী - الفائدة فيه؟ [শপথ ব্যবহৃত হয়েছে, এর জবাব কী এবং এর শপথের উপকারিতা কী?]

৯২. ما المراد بـ "والصافات صفا"؟ [মা বোঝানো দ্বারা কী-والصافات صفا] - ما المراد بـ "والصافات صفا"؟ [হয়েছে?]

৯৩. ما معنى الصافات والزاجرات والتاليات؟ وما المراد بهن؟ [মা বোঝানো দ্বারা কী-الصافات والزاجرات والتاليات] - ما معنى الصافات والزاجرات والتاليات؟ وما المراد بهن؟ [হয়েছে?]

৯৪. ما الحكمة في ذكر القسم في سورة الصافات؟ [সূরা আস সাফফাতে শপথ বাক্য উল্লেখের হেতু কী?]

৯৫. لا يجوز القسم بغير الله، فكيف أقسم الله بمخلوقاته؟ [আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু নামে শপথ করা জায়েজ নয়, তাহলে আল্লাহ কীভাবে তাঁর সৃষ্টি দ্বারা শপথ করেছেন?]

৯৬. ما معنى المشارق ولم خص بالذكر؟ [মা বোঝানো দ্বারা কী-المشارق] - ما معنى المشارق ولم خص بالذكر؟ [হয়েছে?]

৯৭. لماذا قال "رب المشارق" ولم يقل "رب المغرب"؟ اوضح. [আল্লাহ কেন বলেছেন رب المشارق; কেন বলেননি رب المغرب? ব্যাখ্যা কর।]

৯৮. اوضح معنى قوله تعالى "انا زينا السماء الدنيا بزيينة الكواكب" - انا زينا السماء الدنيا بزيينة الكواكب [আল্লাহ তায়ালা বাগী-انا زينا السماء الدنيا بزيينة الكواكب] - اوضح معنى قوله تعالى "انا زينا السماء الدنيا بزيينة الكواكب" [হয়েছে?]

سورة ص (সূরা সোয়াদ)

১২৪. ما هي الحروف المقطعات؟ وما حكمة ذكرها في القرآن؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী কাকে বলে এবং আল কুরআনে তা উল্লেখের হেঁকমত কী?]

১২৫. - الواء في قوله تعالى "ص والقرآن ذي الذكر" لاى شىء؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী কৱৰ আৰু আল কৱআনৰ ডী ডিক্ৰৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত?]]

১২৬. - "اوضح معنى قوله تعالى "والقرآن ذي الذكر" [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী ডী ডিক্ৰৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰ।]

১২৭. - قوله تعالى "والقرآن ذي الذكر" ما محل من الاعراب؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী ডী ডিক্ৰৰ বাক্যটি ইৰাবেৰ কোন মহলে আছে?]

১২৮. - ماذا يستفاد من الايات "ص والقرآن ذي الذكر ... فى الاسباب"؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী ডী ডিক্ৰৰ আয়াতগুলো থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?]

১২৯. - ما المراد بقوله تعالى "بل الذين كفروا فى عزة وشقاق"؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী দ্বাৰা উদ্দেশ্য কী?]

১৩০. - الى ماذا اشير فى قوله تعالى "ان هذا لشيء عجاب"؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী দ্বাৰা কোন দিকে ইঙ্গিত কৰা হয়েছে?]

১৩১. - "اوضح قوله تعالى "ان هذا لشيء يراد" [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী ডী ডিক্ৰৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰ।]

১৩২. لم وضع اسم الظاهر موضع الضمير فى قوله تعالى "وقال الكافرون"؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী দ্বাৰা আয়াতে যমীৰেৰ স্থলে ইসমে যাহেৰ কেন ব্যৱহাৰ কৰা হয়েছে?]

১৩৩. - ما معنى السحر؟ بين حكمه باختصار [সিহৰ অৰ্থ কী? সংক্ষেপে এর শরয়ী হুকুম বৰ্ণনা কৰ।]

১৩৪. - ما معنى السحر والمعجزة؟ وما الفرق بينهما؟ [সিহৰ ও মুজিযাৰ অৰ্থ কী? উভয়েৰ মध्ये পার্থক্য কী?]

১৩৫. - ما المراد بقوله تعالى "انزل عليه الذكر من بيننا"؟ [আল্লাহ তায়ালাৰ বাণী ডী ডিক্ৰৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰ।]

১৩৬. [আল্লাহ হাত التركيب النحوى لقوله تعالى "ان هذا لشيء يراد. ১৩৬. তায়ালার বাণী يراد ان هذا لشيء-এর নাহব অনুযায়ী তারকীব বিশ্লেষণ কর।]
১৩৭. [আল্লাহ - ما المراد بقوله تعالى "ما سمعنا بهذا فى الملة الاخرة؟" ১৩৭. তায়ালার বাণী الملة الاخرة فى الملة ما سمعنا بهذا আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৩৮. [আল্লাহ তায়ালার বাণী - ما معنى قوله تعالى "ذا الايد انه اواب؟" ১৩৮. ডা অয়দ ইনহা অাব-এর অর্থ কী?]
১৩৯. [আল্লাহ তায়ালার কীভাবে كيف ايد الله تعالى ملك داود عليه السلام؟ ১৩৯. হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছেন?]
১৪০. لماذا فزع داود عليه السلام حين دخلت الملائكة عليه؟ وما معنى ১৪০. ফেরেশতারা প্রবেশ করলে দাউদ ان تسوروا المحراب؟ - قوله تعالى "ان تسوروا المحراب؟" [আ] ভয় পেলেন কেন? এবং المحراب-এর অর্থ কী?]
১৪১. شددنا ولا [আয়াতে - كم قراءة فى قوله تعالى "شددنا ولا تشطط" ১৪১. শদদনা ওয়া লা তশতুত-এর কয়টি কেরাত রয়েছে?]
১৪২. [আল্লাহ - "اوضح قوله تعالى "لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ১৪২. তায়ালার বাণী لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه-এর ব্যাখ্যা কর।]
১৪৩. [শয়তানদের অধীনস্থ করার ما الفائدة فى تسخير الشياطين؟ ১৪৩. উপকারিতা কী?]
১৪৪. [আল্লাহ - ما المراد بقوله تعالى "واخرين مقرنين فى الاصفاد" ১৪৪. তায়ালার বাণী اخرين مقرنين فى الاصفاد দ্বারা কী উদ্দেশ্য?]
১৪৫. اذكر الواقعة المتعلقة بالاية "اذ عرض عليه بالعشى الصافنات ১৪৫. সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি اذكر الواقعة المتعلقة بالاية "اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد" - [আয়াত الجياد الصافنات উপলক্ষে উল্লেখ কর।]
১৪৬. [আয়াত - "اوضح معنى قوله تعالى "فطفق مسح بالسوق والاعناق ১৪৬. ফতুফুকু মাসছা বালসুওয়াল আওয়াক-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।]
১৪৭. [ماذا وقع فى التركيب "ان عرض عليه؟" ১৪৭. নাহব অনুযায়ী কী অবস্থায়?]
১৪৮. هل كان ابليس من الملائكة؟ وان لم يكن، فما معنى الاستثناء فى ১৪৮. ইবলিস কি افسد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس؟ - قوله تعالى "فسد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس؟"

ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? না হলে আয়াতে ابليس لا দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]

১৪৯. [ما معنى ابليس؟ ولماذا لم يسجد لادم عليه السلام؟ ১৪৯. [শব্দের ابليس] - ما معنى ابليس؟ ولماذا لم يسجد لادم عليه السلام? অর্থ কী এবং সে কেন আদম (আ)-কে সেজদা করেনি?]

১৫০. [ما معنى السجود لغير الله؟ بين بالوضوح ১৫০. [শব্দের لغير الله] - ما معنى السجود لغير الله؟ بين بالوضوح করার অর্থ কী? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।]

سورة الصافات (সূরা আস সাফফাত)

৯০. প্রশ্ন: সূরা আস সাফফাত কখন নাযিল হয়েছে এবং এতে কত আয়াত রয়েছে?

(مَتَى نَزَلَتْ سُورَةُ الصَّافَّاتِ وَكَمْ آيَةٍ فِيهَا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ৩৭তম সূরা হলো ‘সূরা আস-সাফফাত’। এটি মক্কী সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং আকিদা ও তাওহীদের বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

নাজিল হওয়ার সময় ও আয়াত সংখ্যা:

- **নাজিলের সময় (زَمَنُ النُّزُولِ):** এই সূরাটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়, যখন কাফেরদের বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সূরা আল-আন‘আম, শো‘আরা ও সাবা-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- **আয়াত সংখ্যা (عَدَدُ الْآيَاتِ):** এই সূরায় মোট ১৮২টি আয়াত রয়েছে।

উপসংহার:

সূরা আস-সাফফাত মক্কী সূরা এবং এর আয়াত সংখ্যা ১৮২, যা ফেরেশতাদের শপথ ও তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে।

৯১. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "وَالصَّافَّاتِ صَفًا"-এর মধ্যে "قسم" বা "واو"-এর মধ্যে "قسم" এবং এর শপথের উপকারিতা কী?
الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَالصَّافَّاتِ صَفًا" لِلْقَسَمِ، فَمَا جَوَابُ الْقَسَمِ وَمَا الْفَائِدَةُ (فِيهِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী শপথের পর একটি 'জওয়াবে কসম' বা শপথের মূল বক্তব্য থাকে।

জওয়াবে কসম (جَوَابُ الْقَسَمِ):

আয়াতে وَالصَّافَّاتِ (শপথ সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের)-এর মাধ্যমে যে শপথ করা হয়েছে, তার জওয়াব বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সূরার ৪র্থ আয়াত:

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ

অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ (মাবুদ) এক ও অদ্বিতীয়।”

শপথের উপকারিতা (الْفَائِدَةُ فِي الْقَسَمِ):

তাকসীরুল মুনীর-এর আলোকে শপথের উপকারিতাগুলো হলো:

১. গুরুত্ব আরোপ: মক্কার কাফেররা তাওহীদ বা একত্ববাদ অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মতো পবিত্র সৃষ্টির শপথ করে একত্ববাদের বিষয়টিকে সুদৃঢ় ও নিশ্চিত করেছেন।

২. সাক্ষ্য প্রমাণ: ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় সারিবদ্ধ থাকে এবং তাঁর জিকির করে। এই পবিত্র আত্মারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী। তাই তাদের শপথ করে তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।

উপসংহার:

মূলত তাওহীদের সত্যতাকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করাই এই শপথের মূল উদ্দেশ্য।

৯২. প্রশ্ন: "والصّافات صفا" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
(مَا الْمُرَادُ بِـ "وَالصّافاتِ صفا")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের প্রথম আয়াতে صَفَا وَالصّافات শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে, যা একটি বিশেষ দৃশ্যের অবতারণা করে।

‘ওয়াস-সাফফাতি সাফা’ দ্বারা উদ্দেশ্য:

- **শাব্দিক অর্থ:** ‘সাফফাত’ (الصّافات) শব্দটি ‘সাফফুন’ (صَفٌّ) থেকে এসেছে, যার অর্থ কাতার বা সারি। অর্থাৎ, “শপথ সারিবদ্ধ দলের।”
- **তাকসীর:** অধিকাংশ মুফাসসির, যেমন—ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কাতাদা (রহ.)-এর মতে, এর দ্বারা ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে।
 - যারা আসমানে আল্লাহর ইবাদতের জন্য বা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।
 - দুনিয়াতে মুমিন বান্দারা যেমন নামাজে কাতারবদ্ধ হয়, তেমনি ফেরেশতারাও আসমানে কাতারবদ্ধ থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন: “তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হবে না, যেভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হয়?”

অন্যান্য মত: কেউ কেউ বলেছেন এর দ্বারা জিহাদের ময়দানে সারিবদ্ধ মুজাহিদ বা সারিবদ্ধ ডানাবিশিষ্ট পাখিদের বোঝানো হয়েছে। তবে ‘ফেরেশতা’ হওয়ার মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার:

সুতরাং, এর দ্বারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও ইবাদতগুজার সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে।

৯৩. প্রশ্ন: الزاجرات, الصفات و التالیات শব্দগুলোর অর্থ কী এবং এগুলোর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(مَا مَعْنَى الصَّافَّاتِ وَالزَّاجِرَاتِ وَالتَّالِيَاتِ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِهِنَّ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিনটি বিশেষ গুণের শপথ করেছেন। এগুলো ফেরেশতাদের বিভিন্ন কাজের বর্ণনা।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা (الْمَعْنَى وَالْمُرَادُ):

১. আস-সাফফাত (الصَّافَّاتِ):

- অর্থ: সারিবদ্ধ দল।
- উদ্দেশ্য: যে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে ইবাদতের জন্য বা নির্দেশ পালনের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকে।

২. আয-যাজিরাত (الزَّاجِرَاتِ):

- অর্থ: ধমক দানকারী বা চালনাকারী দল। ‘যাজর’ (زَجَرٌ) অর্থ ধমক দেওয়া বা বাধা দেওয়া।
- উদ্দেশ্য: সেই ফেরেশতারা—
 - যারা মেঘমালাকে ধমক দিয়ে বা হাঁকিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়।
 - অথবা যারা শয়তানকে ধমক দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বা আসমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
 - অথবা যারা পাপাচারী মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বারণ করে।

৩. আত-তালিদাত (التَّالِيَاتِ):

- অর্থ: তিলাওয়াতকারী বা পাঠকারী দল।

- **উদ্দেশ্য:** সেই ফেরেশতারা, যারা আল্লাহর কালাম, জিকির বা ওহি তিলাওয়াত করে। জিবরাঈল (আ.)-সহ অন্যান্য ফেরেশতারা এর অন্তর্ভুক্ত।

সামগ্রিক তাৎপর্য:

আল্লামা ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, এই তিনটি গুণের মাধ্যমে ফেরেশতাদের ইবাদত, বিশ্ব পরিচালনায় তাদের ভূমিকা এবং ওহি পরিবহনে তাদের দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপসংহার:

এই তিনটি শব্দ দ্বারা মূলত ফেরেশতাদের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী।

৯৮. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ"-এর বিশ্লেষণ কর।

("أَوْضَحْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আকাশের সৌন্দর্য ও তাঁর নিপুণ সৃষ্টিশৈলীর বর্ণনা দিয়েছেন। এটি আল্লাহর কুদরতের এক মহিমান্বিত প্রকাশ।

আয়াতের বিশ্লেষণ (تَحْلِيلُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।”

তাকসীরুল মুনীর-এর আলোকে ব্যাখ্যা:

১. আস-সামাউদ দুনিয়া (السَّمَاءُ الدُّنْيَا): এর অর্থ হলো নিকটবর্তী আসমান বা প্রথম আসমান। আমরা পৃথিবী থেকে যে আকাশ দেখি, তাকেই ‘সামাউদ দুনিয়া’ বলা হয়েছে। দুনিয়ার সাপেক্ষে এটি কাছে হওয়ায় এই নামকরণ।

২. বি-যিনাতিনিল কাওয়াকিব (بِزَيْنَةِ الْكَوَاكِبِ): আল্লাহ তাআলা এই আকাশকে শুধুই ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেননি, বরং একে ‘কাওয়াকিব’ বা নক্ষত্ররাজি দিয়ে সাজিয়েছেন। রাতের আকাশে মিটমিট করে জ্বলা তারাগুলো আকাশের অলঙ্কারস্বরূপ। যেমন মানুষ ঘর সাজাতে বাতি বা ঝাড়ুবাতি ব্যবহার করে, তেমনি আল্লাহ বিশাল আকাশকে নক্ষত্র দিয়ে আলোকসজ্জা করেছেন।

৩. উদ্দেশ্য: এই সাজসজ্জার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে:

- সৌন্দর্য (Jamal): মানুষের চোখের প্রশান্তি ও আকাশের শোভাবর্ধন।
- পথপ্রদর্শন (Hidayah): অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া।
- রক্ষণাবেক্ষণ (Hifz): পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এগুলো শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য ‘শিহাব’ বা ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবেও কাজ করে।

উপসংহার:

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কেবল প্রয়োজনের স্রষ্টা নন, তিনি সৌন্দর্য ও নান্দনিকতারও স্রষ্টা।

৯৯. প্রশ্ন: "رب السماوات"-এর মধ্যে "رب" শব্দটি নাহবী অনুযায়ী কী অবস্থায় রয়েছে?

مَاذَا وَقَعَ لَفْظُ "رَبِّ" فِي التَّرْكِيْبِ النَّحْوِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "رَبِّ" (السَّمَاوَاتِ)؟

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের বাক্যের তারকীব বা ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অর্থ অনুধাবনে সহায়তা করে। সূরা আস-সাফফাতের ৫ নং আয়াতে رَبُّ السَّمَاوَاتِ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নাহবী অবস্থান (الْمَوْقِعُ الْإِعْرَابِيُّ):

আয়াতটি হলো: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا...

এখানে رَبُّ (রব্ব) শব্দটি মারফু (পেশ বিশিষ্ট)। এর অবস্থান সম্পর্কে ব্যাকরণবিদদের একাধিক মত রয়েছে:

১. খবরে মুবতাদা মাহযুফ (خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحذُوفٍ): এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত। অর্থাৎ এখানে একটি উহ্য মুবতাদা (Subject) রয়েছে, যা হলো هُوَ (হুয়া - তিনি)।

- পূর্ণ বাক্য: رَبُّ السَّمَاوَاتِ (هُوَ)
- অর্থ: “(তিনি) আসমান ও জমিনের রব।”

২. বদল (بَدَلٌ): পূর্ববর্তী আয়াতে إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ (নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক) — এই বাক্যের وَاحِدٌ (এক) শব্দ থেকে رَبُّ শব্দটি ‘বদল’ বা পরিবর্তন হিসেবে এসেছে। যেহেতু وَاحِدٌ শব্দটি মারফু (খবরে ইল্লা), তাই رَبُّ শব্দটিও মারফু হয়েছে।

৩. সিফাত (صِفَةٌ): এটি وَاحِدٌ-এর সিফাত বা বিশেষণ হতে পারে। অর্থাৎ, সেই এক ইলাহ, যিনি আসমান ও জমিনের রব।

উপসংহার:

সারকথা হলো, رَبُّ শব্দটি মারফু এবং এটি পূর্ববর্তী একত্ববাদের ঘোষণারই ধারাবাহিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা।

১০০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "الْمَلَأَ الْأَعْلَى" দ্বারা কী উদ্দেশ্য?
(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "الْمَلَأَ الْأَعْلَى"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

শয়তানরা আসমানের খবর চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের কঠোরভাবে প্রতিহত করা হয়। সূরা আস-সাফফাতের ৮ নং আয়াতে এই প্রসঙ্গেই ‘মালা-ই আ‘লা’ শব্দটি এসেছে।

‘আল-মালা-ই আ‘লা’ দ্বারা উদ্দেশ্য:

- **শাব্দিক অর্থ:** ‘মালা’ (مَلَأَ) অর্থ দল বা পরিষদ। ‘আ‘লা’ (أَعْلَى) অর্থ সুউচ্চ বা উর্ধ্বজগৎ। সুতরাং এর অর্থ ‘উর্ধ্বজগতের পরিষদ’।
- **পারিভাষিক অর্থ:** তাকসীরবিদদের মতে, এর দ্বারা ফেরেশতাদের উচ্চতর পরিষদ বা সম্মানিত ফেরেশতাদের জামাতকে বোঝানো হয়েছে ¹।
- তাকসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা আসমানে ফেরেশতাদের নিয়ে যে মজলিস বা বৈঠক করেন, যেখানে তিনি তাঁর ফয়সালা ও ওহি জারি করেন, তাকেই ‘মালা-ই আ‘লা’ বলা হয়। শয়তান ও জিনরা এই উচ্চতর পরিষদের আলোচনা শোনার জন্য আসমানের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু উক্বাপিও বা ‘শিহাব’ নিক্ষেপ করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

আল্লাহ বলেন:

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى

অর্থ: “তারা উর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে পায় না।”

উপসংহার:

‘মালা-ই আ‘লা’ হলো আসমানের সেই সংরক্ষিত ও পবিত্র স্থান, যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে সমবেত হন এবং যা শয়তানদের নাগালের বাইরে।

১০১. প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী "إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ" আয়াতে উদ্দেশ্য কী?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেররা পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। আল্লাহ তাআলা তাদের সৃষ্টির মূল উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সূরা আস-সাফফাতের ১১ নং আয়াতে তাদের অহংকার চূর্ণ করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ

অর্থ: “আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে।”

উদ্দেশ্যসমূহ:

১. সৃষ্টির তুচ্ছতা প্রমাণ: আল্লাহ ফেরেশতাদের সৃষ্টির (আলোর তৈরি) বিশালতা বর্ণনা করার পর মানুষের সৃষ্টির উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘তিনি লাযিব’ (طِينٍ لَّازِبٍ) অর্থ হলো আঠালো বা চিপচিপে কাদা-মাটি। অর্থাৎ, মানুষ এমন এক সাধারণ উপাদান (মাটি) থেকে সৃষ্টি, যা শুকিয়ে গেলে ভঙ্গুর হয়ে যায়। সুতরাং তাদের অহংকার করা সাজে না।

২. পুনরুত্থানের যুক্তি: যে আল্লাহ সাধারণ কাদা-মাটি দিয়ে মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেই উপাদান মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় তা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেও কঠিন নয়।

৩. কাফেরদের বিস্ময়ের জবাব: কাফেররা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিশালতার সামনে নিজেদের সৃষ্টিকে বড় মনে করত না। আল্লাহ বললেন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু মানুষের সৃষ্টি তো সামান্য মাটি থেকে, যা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

উপসংহার:

এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো—মানুষকে তার সৃষ্টির হীনতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সামনে মাথানত করানো।

১০২. প্রশ্ন: আয়াতে "حَفْظًا" শব্দটির নাহব অনুযায়ী অবস্থান কী?
(مَاذَا وَقَعَ قَوْلُهُ تَعَالَى "حِفْظًا" فِي التَّرَكِيبِ النَّحْوِيِّ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আসমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে حِفْظًا (হিফজান) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ (I'rab) আয়াতের অর্থকে স্পষ্ট করে।

নাহবী অবস্থান (الْمَوْقِعُ الْإِعْرَابِيُّ):

আয়াতটি হলো: وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ।

ব্যাকরণবিদদের মতে حِفْظًا শব্দটি মানসুব (জবরবিশিষ্ট) এবং এর অবস্থান সম্পর্কে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. মাফ'উলে মুতলাক (مَفْعُولٌ مُّطْلَقٌ):

অধিকাংশ নাহবিদের মতে, এখানে একটি 'ফেল' বা ক্রিয়া উহ্য (Mahzuf) আছে।

• তাকদিরি ইবারত: وَحَفِظْنَاَهَا حِفْظًا

• অর্থ: “এবং আমি তাকে (আসমানকে) সুরক্ষিত করেছি যেমন সুরক্ষা করা উচিত।” এখানে حِفْظًا শব্দটি সেই উহ্য ক্রিয়ার উৎস বা মাসদার হিসেবে তাকিদ বা জোর বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. মাফ'উলে লাহ্ (مَفْعُولٌ لَهُ):

কারও কারও মতে, এটি পূর্ববর্তী ক্রিয়া زَيْنًا (আমি সাজিয়েছি)-এর কারণ হিসেবে এসেছে।

• অর্থ: “আমি আসমানকে সাজিয়েছি... এবং সুরক্ষার জন্য (একে নক্ষত্রখচিত করেছি)।” অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সুরক্ষা দান করা।

তাফসীরুল মুনীর-এর মত:

ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) প্রথম মতটিকেই (মাফ‘উলে মুতলাক) প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, শয়তান থেকে আসমানকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উপসংহার:

حَفْظًا শব্দটি আসমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৃঢ়তা ও গুরুত্ব প্রকাশ করছে।

১০৩. প্রশ্ন: হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে তুমি কী শিক্ষাগ্রহণ কর?

(مَاذَا تَعْلَمُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন ‘মিল্লাতে ইবরাহীমি’র পিতা এবং একত্ববাদের একনিষ্ঠ ধারক। সূরা আস-সাফফাতে তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার (সন্তান কুরবানি) ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে আমরা বহু শিক্ষা পাই।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ (الدُّرُوسُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. আল্লাহর নির্দেশের প্রতি চরম আনুগত্য (الاستِسْلَامُ):

হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে জবেহ করছেন। এটি ছিল আল্লাহর ওহি। তিনি কোনো প্রশ্ন বা দ্বিধা ছাড়াই এই কঠিন আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এর শিক্ষা হলো—আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের আবেগ ও ভালোবাসাকে বিসর্জন দেওয়াই প্রকৃত ঈমান।

২. তাওহীদের ওপর অবিচলতা:

তিনি তাঁর পিতা ও কওমের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একাই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ

অর্থ: “আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।” (সূরা সাফফাত: ৯৯)। সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করেও তিনি একত্ববাদের ওপর অটল ছিলেন।

৩. সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া:

তিনি কুরবানির বিষয়টি গোপন না করে পুত্রের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। ফলে পুত্র ইসমাইল (আ.)-ও ধৈর্য ও আনুগত্যের শিক্ষা পেলেন এবং বললেন, “বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করুন।”

৪. ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল:

আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে সন্তান কুরবানি—প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর ওপর ভরসা করলে আগুনও শান্তিময় হয়ে যায়।

উপসংহার:

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায় যে, জীবনের সবকিছুর চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়াই মুমিনের কাজ।

১০৪. প্রশ্ন: নবী যবীহুল্লাহর নাম কী?

(مَا اسْمُ النَّبِيِّ الذَّبِيحِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

‘যবীহুল্লাহ’ (আল্লাহর রাহে জবেহকৃত) উপাধিটি কোন নবীর—হযরত ইসমাইল (আ.) নাকি হযরত ইসহাক (আ.)—এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও কুরআনের বর্ণনা ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট।

যবীহুল্লাহর পরিচয়:

বিশুদ্ধ ও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে, হযরত ইসমাইল (আ.)-ই হলেন ‘যবীহুল্লাহ’।

তাকসীরুল মুনীর-এ এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে:

১. কুরআনের ধারাবাহিকতা: সূরা আস-সাফফাতে কুরবানির ঘটনা বর্ণনা করার পর (১০১-১০৭ আয়াত) পরবর্তী ১১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: “এবং আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম।”

কুরবানির ঘটনার ‘পরে’ ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়া প্রমাণ করে যে, কুরবানির ঘটনাটি ঘটেছিল প্রথম সন্তান ইসমাইল (আ.)-এর সাথে।

২. পুত্র সন্তানের বৈশিষ্ট্য: কুরবানির আয়াতে সেই পুত্রকে غُلَامٌ حَلِيمٌ (ধৈর্যশীল বালক) বলা হয়েছে, যা ইসমাইল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়।

৩. মক্কা ও কুরবানি: কুরবানির ঘটনা মিনার প্রান্তরে ঘটেছিল, যেখানে হাজিরা কুরবানি দেন। ইসমাইল (আ.) মক্কায় বসবাস করতেন, আর ইসহাক (আ.) ফিলিস্তিনে। সুতরাং মক্কায় কুরবানি ইসমাইল (আ.)-এর সাথেই সংশ্লিষ্ট।

উপসংহার:

যদিও ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দাবি করে যে ইসহাক (আ.) যবীহ ছিলেন, কিন্তু কুরআনের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ করে যে, হযরত ইসমাইল (আ.)-ই ছিলেন সেই মহান আত্মত্যাগী নবী বা যবীহুল্লাহ।

১০৫. প্রশ্ন: আয়াতে "الكواكب"-এর মহলে ইরাব কী?

(مَا هُوَ الْأَعْرَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "الْكَوَاكِبُ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ৬ নং আয়াতে الْكَوَاكِبِ بِزِيْنَةٍ বাক্যাংশটি পঠনরীতি বা ‘কিরাত’-এর ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ইরাব বা ব্যাকরণগত রূপ গ্রহণ করে।

ইরাব বা ব্যাকরণগত অবস্থান (الْأَعْرَابُ):

আয়াতটি হলো: **إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةِ الْكَوَاكِبِ**

১. মুজাফ ইলাইহি (مُضَافٌ إِلَيْهِ): [এটিই প্রসিদ্ধ কিরাত]

হযরত হাফস (রহ.)-সহ অধিকাংশ কারী **بِزَيْنَةِ** শব্দটিকে তানভিন ছাড়া (ইজাফত সহকারে) পড়েছেন।

- অবস্থান: **زَيْنَةٌ** হলো মুজাফ, আর **الْكَوَاكِبِ** হলো মুজাফ ইলাইহি।
- হুকুম: মুজাফ ইলাইহি সর্বদা মাজরুর (জের বিশিষ্ট) হয়। তাই এখানে **الْكَوَاكِبِ** হয়েছে।
- অর্থ: “নক্ষত্রের সৌন্দর্য দ্বারা।”

২. বদল বা আতফে বায়ান (بَدَلٌ أَوْ عَطْفٌ بَيَانٍ): [অন্যান্য কিরাতে]

কোনো কোনো কারী (যেমন শু‘বা) **بِزَيْنَةِ** শব্দে তানভিন দিয়ে পড়েছেন। সেক্ষেত্রে **الْكَوَاكِبِ**-এর দুটি অবস্থা হতে পারে:

- বদল: এটি **زَيْنَةٌ** থেকে বদল হয়েছে। যেহেতু **زَيْنَةٌ** মাজরুর, তাই **الْكَوَاكِبِ**-ও মাজরুর।
- অর্থ: “আমি আসমানকে সাজিয়েছি সৌন্দর্য দিয়ে—অর্থাৎ নক্ষত্র দিয়ে।” (এখানে নক্ষত্রই হলো সেই সৌন্দর্য)।

উপসংহার:

আমাদের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ পঠনরীতিতে **الْكَوَاكِبِ** শব্দটি মুজাফ ইলাইহি হিসেবে মাজরুর বা জেরবিশিষ্ট হয়েছে।

১০৬. প্রশ্ন: শয়তান আগুনের তৈরি, তাহলে কীভাবে সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে?

(الشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ يَحْتَرِقُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

শয়তান বা জিন জাতি আগুনের তৈরি। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, আগুন দিয়ে আগুনকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব? আকিদাগত ও যৌক্তিক দিক থেকে এর চমৎকার সমাধান রয়েছে।

আগুন দ্বারা আগুনের শাস্তির স্বরূপ:

তাকসীরুল মুনীর ও অন্যান্য কিতাবের আলোকে এর উত্তর হলো:

১. উপাদানের পরিবর্তন: মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ এখন আর মাটি নয়; বরং রক্ত-মাংসের মানুষ। তাকে মাটির ঢিল ছুড়লে সে ব্যথা পায়। ঠিক তেমনি, শয়তানকে আগুনের শিখা (Nar as-Samum) থেকে সৃষ্টি করা হলেও বর্তমানে তার সত্তা বা গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। তাই জাহান্নামের আগুন তার জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক হবে।

২. আগুনের তীব্রতা: জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার সাধারণ আগুনের মতো নয়। তা বহুগুণ বেশি উত্তপ্ত ও শক্তিশালী। হাদিসে এসেছে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি তীব্র। তাই শক্তিশালী আগুন দুর্বল আগুনকে গ্রাস করতে পারে এবং কষ্ট দিতে পারে।

৩. আল্লাহর কুদরত: শাস্তি কার্যকর হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যিনি পানিতে ডুবিয়ে ফেরাউনকে মারতে পারেন, তিনি আগুনের তৈরি শয়তানকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিতেও সক্ষম।

উপসংহার:

উপাদান এক হলেও শাস্তির কার্যকরিতা ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং শয়তান আগুনের তৈরি হলেও জাহান্নামের আগুন তার জন্য চরম যন্ত্রণাদায়ক হবে।

১০৭. প্রশ্ন: সূরা আস সাফফাতে নূহ (আ) ও অন্যান্য নবীগণের কাহিনি উল্লেখের হেকমত কী?

(مَا الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ قِصَّةِ نُوحٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْقِصَصِ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতে হযরত নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মুসা (আ.), হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.) এবং ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য বা হেকমত রয়েছে।

ঘটনা উল্লেখের হেকমত (حِكْمَةُ الْقَصَصِ):

১. রাসূল (সা.)-কে সাঙ্গনা দান: মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ব্যথিত ছিলেন, তখন আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীদের বিজয়ের ইতিহাস শুনিতে তাঁকে সাঙ্গনা দিয়েছেন। বোঝানো হয়েছে যে, নবীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই হয়।

২. সুস্পষ্ট সতর্কবাণী: নূহ (আ.)-এর কওম বা লুত (আ.)-এর কওম যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল, মক্কার কাফেরদেরও সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহর ওয়াদা পূরণ: আল্লাহ যে তাঁর নেক বান্দাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেন (যেমন নূহ আ.-কে তুফান থেকে এবং ইবরাহীম আ.-কে আগুন থেকে), তা প্রমাণ করাই এই ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্য।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: “এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।”

উপসংহার:

মূলত হকের বিজয় এবং বাতিলের বিনাশ—এই চিরন্তন সত্যটি তুলে ধরাই ঘটনাগুলো উল্লেখের মূল হেকমত।

১০৮. প্রশ্ন: "سلام على نوح في العالمين" বাক্যের তারকীব কর।

("رَكِبَ قَوْلُهُ تَعَالَى "سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ.)-এর ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন। বাক্যটির নাহবী তারকীব বা বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো।

তারকীব (التَّرْكِيْبُ النَّحْوِيّ):

- **سَلَامٌ (সালামুন):** এটি **মুবতাদা (Subject)**। এটি নাকেরা (অনিদিষ্ট) হলেও দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। এর **খবর (Predicate)** উহ্য আছে।
- **عَلَى (আলা):** হরফে জার।
- **نُوحٍ (নুহিন):** মাজরুর।
 - ‘জার’ ও ‘মাজরুর’ মিলে **মুতাআল্লিক (সম্পৃক্ত)** হয়েছে উহ্য খবরের সাথে। (তাকদিরি ইবারত: *সালামুন কাইনুন বা সাবিতুন আলা নুহিন*)।
- **فِي (ফি):** হরফে জার।
- **الْعَالَمِينَ (আল-‘আলামীন):** মাজরুর (ইরাব হয়েছে ‘ইয়া’ দ্বারা, কারণ এটি জমা মুজাক্কার সালিম)।
 - এই ‘জার’ ও ‘মাজরুর’ মিলে **মুতাআল্লিক** হয়েছে ‘সালামুন’-এর সাথে। অর্থাৎ, বিশ্বজগতে তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

বাক্যের গঠন: মুবতাদা ও তার মাহযুফ খবর মিলে ‘**জুমলা ইসমিয়া ইনশাইয়া**’ (ইচ্ছাসূচক বাক্য বা দোয়া) গঠিত হয়েছে।

১০৯. প্রশ্ন: নূহ (আ)-এর সন্তানদের নাম উল্লেখ কর।

(أَذْكُرُ أَسْمَاءَ أَوْلَادِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানবজাতির ‘দ্বিতীয় পিতা’ বা ‘আদম সানি’ বলা হয় হযরত নূহ (আ.)-কে। কারণ মহাপ্লাবনের পর তাঁর বংশধররাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সূরা আস-সাফাতের ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে: **وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ** (আমি তার বংশধরদেরই অবশিষ্ট রেখেছি)।

নূহ (আ.)-এর সন্তানদের নাম:

ঐতিহাসিক ও তাফসিরবিদদের মতে, হযরত নূহ (আ.)-এর চারজন পুত্র ছিল:

১. সাম (سَام): তাকে আরব, পারস্য ও রোমকদের পিতা বলা হয়। অধিকাংশ নবী ও পুণ্যবান লোক তাঁর বংশ থেকেই এসেছেন।

২. হাম (حَام): তাকে হাবশি (আফ্রিকান), হিন্দি ও সিন্ধিদের আদি পিতা মনে করা হয়।

৩. ইয়াফিছ (يَافِث): তাকে তুর্কি, ইয়াজুজ-মায়ুজ ও চীনাদের আদি পিতা বলা হয়।

(এই তিনজন ঈমান এনেছিলেন এবং নূহ আ.-এর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন)

৪. কানা'আন (كَانَعَان) বা ইয়াম (يَام): সে ছিল কাফের। নূহ (আ.) তাকে নৌকায় ডাকলেও সে ওঠেনি এবং প্লাবনে ডুবে মারা যায়। কুরআনে তাকে 'অসৎকর্মপরায়ণ' বলা হয়েছে।

উপসংহার:

বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ মূলত নূহ (আ.)-এর এই তিন মুমিন পুত্রের (সাম, হাম, ইয়াফিছ) বংশধর।

১১০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ" -এর ব্যাখ্যা কর।
("فَسِّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ")

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের পর মানবজাতির অস্তিত্ব কীভাবে টিকে রইল, তা সূরা আস-সাফফাতের ৭৭ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমেই নূহ (আ.)-কে 'দ্বিতীয় আদম' বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলা হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

অর্থ: “এবং আমি তার (নূহের) বংশধরদেরই অবশিষ্ট রেখেছি।”

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর ব্যাখ্যা:

১. বংশধারা অব্যাহত থাকা: মহাপ্লাবনের সময় নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় যে ৮০ জন (বা ভিন্ন মতে ৪০ জন) ঈমানদার উঠেছিলেন, তাদের কারও বংশধারা পরবর্তীতে পৃথিবীতে টিকে থাকেনি। কেবল নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র—সাম, হাম ও ইয়াফিছ—এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের বংশবিস্তার ঘটেছে।

২. তিন পুত্রের বংশধর:

- সাম: আরব, পারস্য ও রোমকদের আদি পিতা।
- হাম: আফ্রিকান ও কৃষ্ণকায় জাতিগুলোর আদি পিতা।
- ইয়াফিছ: তুর্কি, তাতার ও পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলোর আদি পিতা।

৩. আদমে সানি: যেহেতু বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ নূহ (আ.)-এর বংশধর, তাই তাঁকে ‘আদমে সানি’ বা দ্বিতীয় আদম বলা হয়।

উপসংহার:

কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ নূহ (আ.)-এরই সন্তান, যা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

১১১. প্রশ্ন: নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

‘নবী’ ও ‘রাসূল’ শব্দ দুটি ওহিপ্ৰাপ্ত মহান ব্যক্তিদের উপাধি। তবে পরিভাষাগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সূরা আস-সাফফাতে নূহ (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নবী ও রাসূলের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

১. সংজ্ঞা:

- রাসূল (الرَّسُولُ): সেই নবী, যাকে আল্লাহ তাআলা নতুন শরিয়ত (জীবনবিধান) বা আসমানি কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং উম্মতের কাছে তাবলিগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
- নবী (النَّبِيُّ): সেই ওহিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বা সংবাদ পান। তিনি নতুন শরিয়ত বা কিতাব পেতেও পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। তিনি সাধারণত পূর্ববর্তী রাসূলের শরিয়ত প্রচার করেন।

২. ব্যাপকতা (الْغُفُومُ وَالْخُصُوصُ):

- প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। অর্থাৎ, রাসূলের মর্যাদা নবীর চেয়ে বিশেষ ও উঁচুতে।
- সংখ্যাগত দিক থেকেও নবীদের সংখ্যা বেশি (১ লক্ষ ২৪ হাজার), আর রাসূলদের সংখ্যা কম (৩১৩ জন)।

৩. কিতাব ও শরিয়ত:

- রাসূলদের সাধারণত নতুন কিতাব বা বিধান দেওয়া হয় (যেমন মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ সা.)।
- নবীরা অধিকাংশ সময় পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসরণ ও সংস্কার করেন (যেমন বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবী)।

উপসংহার:

রাসূল হলেন বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত নবী, যারা নতুন বিধান নিয়ে আসেন।

১১২. প্রশ্ন: "نوح" শব্দটির তাহকীক কর।
(حَقَّقْ كَلِمَةَ "نُوح")

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত নূহ (আ.) ছিলেন প্রথম বা বড় রাসূল (শাইখুল আম্বিয়া)। তাঁর নামের উৎপত্তি ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো।

তাহকীক (التَّحْقِيقُ الصَّرْفِيُّ):

- শব্দ: নূহ (نُوحٌ)।
- শ্রেণি: এটি একটি ইসমে আলাম বা নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)।
- ভাষা ও রূপ: যদিও এটি অনারব (আ'জামি) শব্দ, কিন্তু তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যবর্ণ সাকিন (নিশ্চল) হওয়ার কারণে এটি আরবি ব্যাকরণে 'মুনসারিফ' (রূপান্তরশীল)। অর্থাৎ, এতে তানভিন ও জের যুক্ত হতে পারে।
- মূলধাতু ও উৎপত্তি:
 - অনেক ভাষাবিদের মতে, এটি আরবি শব্দ 'নওহ' (نَوْحٌ) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো বিলাপ করা বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।
- নামকরণের কারণ: তাঁকে 'নূহ' বলা হয় কারণ তিনি আল্লাহর ভয়ে অথবা নিজের কওমের নাফরমানি দেখে এবং তাদের ধ্বংসের আশঙ্কায় দীর্ঘকাল ধরে অত্যধিক ক্রন্দন করেছিলেন।

উপসংহার:

'নূহ' শব্দটি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন) বা তাঁর জীবনের সংগ্রামের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

১১৩. প্রশ্ন: নূহ (আ.)-এর যুগে তুফান কি সমগ্র পৃথিবীতে হয়েছিল?
(هَلِ الطُّوفَانُ كَانَ جَارِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْضِ فِي عَهْدِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ যে মহাপ্লাবন বা তুফান দিয়েছিলেন, তার ব্যাপ্তি নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে।

তুফানের ব্যাপকতা (عُمْومُ الطُّوفَانِ):

জমহুর মুফাসসিরীন ও তাকসীরুল মুনীর-এর মতে, নূহ (আ.)-এর যুগের তুফান সমগ্র পৃথিবীজুড়ে সংঘটিত হয়েছিল। এর সপক্ষে যুক্তিগুলো হলো:

১. নূহ (আ.)-এর বদদোয়া: হযরত নূহ (আ.) বদদোয়া করেছিলেন:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَرًا

অর্থ: “হে আমার রব! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোনো বসবাসকারীকে অবশিষ্ট রেখো না।” (সূরা নূহ: ২৬)। যদি তুফান আংশিক এলাকায় হতো, তবে অন্য এলাকার কাফেররা বেঁচে যেত।

২. সর্বজনীন ধ্বংস: কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ কেবল নৌকাবাহীদের রক্ষা করেছেন এবং বাকি সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এমনকি পর্বতশৃঙ্গে আশ্রয় নেওয়া নূহ (আ.)-এর পুত্রও বাঁচতে পারেনি। পানি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করেছিল।

৩. মানবজাতির নতুন সূচনা: ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বর্ণনামতে, তুফানের পর কেবল নূহ (আ.)-এর তিন পুত্রের বংশধররাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তুফান আঞ্চলিক হলে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষ বেঁচে থাকত এবং তাদের বংশধরও থাকত।

উপসংহার:

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, সেই প্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী এবং তা সমগ্র পৃথিবীর জীবজন্তু ও অবিশ্বাসী মানুষকে গ্রাস করেছিল।

১১৪. প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী "وَأَن مِّن شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ" শব্দের যমীর কার দিকে ফিরেছে?
(إِلَى مَنْ يَرْجِعُ ضَمِيرُ "شَيْعَتِهِ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَن مِّن شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে পূর্ববর্তী একজন নবীর ‘শিয়া’ বা অনুসারী বলেছেন।

যমীর বা সর্বনামের মারজা (مَرْجِعُ الضَّمِيرِ):

আয়াতে شَيْعَتِهِ (তার দলের/অনুসারীদের) শব্দের ০ (হু - তার) যমীরটি হযরত নূহ (আ.)-এর দিকে ফিরেছে।

- ব্যাখ্যা: যদিও নূহ (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ছিল, তবুও হযরত ইবরাহীম (আ.) আকিদা ও দ্বীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে হযরত নূহ (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন। তাফসীরুল মুনীর-এ বলা হয়েছে, তিনি নূহ (আ.)-এর মিনহাজ বা পথের ওপর অটল ছিলেন।

উপসংহার:

সুতরাং, এখানে ‘তার অনুসারী’ বলতে নূহ (আ.)-এর অনুসারী বোঝানো হয়েছে।

১১৫. প্রশ্ন: নূহ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল?
(كَمْ مَدَّةً بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ?)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) উভয়েই ‘উলুল আযম’ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যবর্তী সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সময়ের ব্যবধান (الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّةُ):

তাফসীরুল মুনীর ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থের আলোকে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়:

১. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত: তাঁদের দুজনের মাঝখানে ২,৬৪০ বছর (দুই হাজার ছয়শত চল্লিশ বছর)-এর ব্যবধান ছিল।

২. অন্যান্য মত: কেউ কেউ বলেছেন এই ব্যবধান ছিল ২,০০০ বছর। আবার কারও মতে, তাঁদের মাঝখানে মাত্র দুজন নবী (হুদ ও সালিহ আ.) এসেছিলেন, তাই ব্যবধান আরও কম হতে পারে।

৩. প্রজন্মের হিসাব: কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁদের মাঝে ১০টি প্রজন্মের (Generations) ব্যবধান ছিল।

উপসংহার:

সঠিক সময়কাল আল্লাহই ভালো জানেন, তবে তাঁদের মাঝখানে যে দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১১৬. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ"-এর অর্থ কী?
(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কওমের মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণের জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যখন তাঁর কওম মেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন তিনি আকাশের তারার দিকে তাকালেন। এটি সূরা সাফফাতের ৮৮ নং আয়াতের ঘটনা।

আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

অর্থ: “অতঃপর সে তারার দিকে একবার তাকাল।”

উদ্দেশ্য:

১. কৌশল অবলম্বন: ইবরাহীম (আ.)-এর কওম জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত তারার প্রভাবে মানুষের রোগ-শোক হয়। ইবরাহীম (আ.) তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারার দিকে তাকিয়ে বললেন, اِنِّیْ سَفِیْمٌ (আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব)। এটি ছিল মেলায় না যাওয়ার এবং মূর্তিদের ভাঙার সুযোগ তৈরি করার একটি বাহানা বা ‘তাওরিয়া’ (দ্ব্যর্থবোধক কথা)।

২. চিন্তাভাবনা: অথবা তিনি তারার দিকে তাকিয়ে সময় বা ক্ষণ গণনা করছিলেন যে, কখন তারা মেলায় যাবে এবং কখন তিনি মূর্তি ভাঙার সুযোগ পাবেন।

উপসংহার:

মূলত মূর্তিপূজক কওমকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি তারার দিকে তাকানোর ভান করেছিলেন।

১১৭. প্রশ্ন: ইবরাহীম (আ) কীভাবে নূহ (আ)-এর অনুসারী ছিলেন, অথচ তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হয়েছে?

كَيْفَ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ شِيعَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ مَضَتْ (بَيْنَهُمَا مُدَّةٌ طَوِيْلَةٌ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সাধারণত ‘শিয়া’ বা অনুসারী বলতে সমসাময়িক দলের লোকদের বোঝায়। কিন্তু হাজার বছরের ব্যবধান থাকার পরও ইবরাহীম (আ.)-কে নূহ (আ.)-এর শিয়া বলা হয়েছে।

অনুসারী হওয়ার কারণ:

১. আকিদাগত ঐক্য (وَحْدَةُ الْعَقِيْدَةِ): নূহ (আ.) যে তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, ইবরাহীম (আ.)-ও ঠিক একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের শরিয়তের শাখা-প্রশাখা ভিন্ন হলেও মূল দ্বীন (ইসলাম) ছিল এক।

২. সংগ্রামের সাদৃশ্য: নূহ (আ.) যেমন তাঁর অবাধ্য জাতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং আল্লাহর দীনের জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন, ইবরাহীম (আ.)-ও মূর্তিপূজক জাতির বিরুদ্ধে অনুরূপ সংগ্রাম করেছেন। এই আদর্শিক মিলের কারণেই তাঁকে নূহ (আ.)-এর দলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

৩. তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা: এখানে ‘শিয়া’ অর্থ হলো যারা একই পথ ও মতের অনুসারী। ইবরাহীম (আ.) নূহ (আ.)-এর সন্মত ও পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন বলে তাঁকে তাঁর শিয়া বলা হয়েছে।

উপসংহার:

সময়ের দূরত্ব আদর্শিক ঐক্যে কোনো বাধা নয়। তাই ইবরাহীম (আ.) ছিলেন নূহ (আ.)-এর প্রকৃত উত্তরসূরি।

**১১৮. প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী "سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ" দ্বারা কী উদ্দেশ্য?
(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ"?)**

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ১৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা একজন মহান নবীর ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু ‘আলে ইয়াসীন’ বা ‘ইল-ইয়াসীন’ শব্দটির পঠন ও ব্যাখ্যা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

‘আলে ইয়াসীন’ দ্বারা উদ্দেশ্য:

অধিকাংশ মুফাসসির ও তাফসীরুল মুনীর-এর মত অনুযায়ী, এর দ্বারা হযরত ইলিয়াস (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে।

১. নামের ভিন্নতা: আরবরা অনেক সময় নামের উচ্চারণ বা বানান পরিবর্তন করে থাকে। যেমন ‘মিকাইল’-কে ‘মিকাল’ বা ‘মিকায়িন’ বলা হয়। ঠিক তেমনি ‘ইলিয়াস’-কে ছন্দের মিল ও সম্মানের জন্য ‘ইল-ইয়াসীন’ বলা হয়েছে। এর আগের আয়াতগুলোতে ইলিয়াস (আ.)-এর আলোচনাই চলছিল।

২. বিকল্প কিরাত: ইবনে মাসউদ (রা.)-সহ কোনো কোনো কারী একে سَلَامٌ عَلَىٰ إِدْرِاسِينَ (সালামুন আলা ইদরা-সীন) পড়েছেন, যা ইলিয়াস (আ.)-এরই অন্য নাম (ইদ্রিস ও ইলিয়াস একই ব্যক্তি কি না এ নিয়ে মতভেদ আছে)।

৩. ভিন্ন মত: কেউ কেউ একে آلِ يَاسِينَ (আলি ইয়াসীন) বা ‘ইয়াসীন-এর পরিবার’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, ইয়াসীন হলো মহানবী (সা.)-এর নাম। তবে পূর্বের আয়াতের ধারাবাহিকতায় (ইলিয়াস আ.-এর ঘটনা) প্রথম মতটিই (ইলিয়াস আ.) অধিক গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার:

সুতরাং, এখানে ‘ইল-ইয়াসীন’ বা ‘আলে ইয়াসীন’ বলতে হযরত ইলিয়াস (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে।

**১১৯. প্রশ্ন: "شجرة يقطين" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।
(مَا الْمُرَادُ بِشَجَرَةِ يَقْطِينٍ؟ بَيِّنْ بِالتَّوْضِيحِ)**

উত্তর:

ভূমিকা:

মাছের পেট থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.) অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁর জন্য একটি বিশেষ গাছ উৎপন্ন করেছিলেন। সূরা আস-সাফফাতের ১৪৬ নং আয়াতে এর নাম ‘শাজারাতাম মিন ইয়াকতিন’ বলা হয়েছে।

‘শাজারাতু ইয়াকতিন’-এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য:

- **শাব্দিক অর্থ:** আরবি ভাষায় ‘ইয়াকতিন’ (يَقْطِين) বলা হয় এমন যেকোনো গাছকে, যার কাণ্ড বা গুঁড়ি নেই এবং যা লতার মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে (যেমন—লাউ, কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদি)।
- **তাকসিরি মত:** অধিকাংশ সাহাবি ও মুফাসসিরের মতে, এখানে লাউ বা কদু গাছ (Gourd Tree) বোঝানো হয়েছে।
- **কেন লাউ গাছ? আল্লাহ এই গাছটি নির্বাচনের পেছনে বিশেষ হেঁকমত রয়েছে:**

১. ছায়া ও কোমলতা: এর পাতাগুলো বেশ বড় ও কোমল হয়, যা ইউনুস (আ.)-এর ক্ষতবিক্ষত শরীরের জন্য আরামদায়ক ছিল।

২. পোকা-মাকড় মুক্ত: এই গাছের একটি বিশেষ গুণ হলো, এর কাছে মাছি বা ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ভিড়ে না। মাছের পেটের লাল ও দুর্গন্ধে ইউনুস (আ.)-এর শরীরে পোকা বসার আশঙ্কা ছিল, তাই এই গাছ তাঁকে সুরক্ষা দিয়েছে।

৩. পুষ্টি: এর ফল পুষ্টিকর ও সহজে হজমযোগ্য।

উপসংহার:

‘ইয়াকতিন’ হলো লাউ জাতীয় লতাগুল্ম, যা আল্লাহর কুদরতে ইউনুস (আ.)-এর আরোগ্য লাভের উসিলা হয়েছিল।

১২০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ"-এর ব্যাখ্যা কর।

("فَسِرَّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ")

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত ইউনুস (আ.)-কে ‘নিনেভা’ (Nineveh) বা মসুল নগরীর বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। সূরা আস-সাফফাতের ১৪৭ নং আয়াতে তাদের সংখ্যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

অর্থ: “এবং আমি তাকে এক লক্ষ বা তার চেয়ে বেশি লোকের কাছে প্রেরণ করলাম।”

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

১. ‘আউ’ (أَوْ) বা ‘অথবা’ শব্দের ব্যবহার: সাধারণত ‘অথবা’ শব্দটি সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহর বাণীতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে ‘আউ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘মানুষের দৃষ্টিতে’ (In the estimation of the beholder) বোঝাতে। অর্থাৎ, কোনো মানুষ যদি সেই বিশাল জনসমুদ্র দেখত, তবে সে নিশ্চিতভাবে বলত যে, এরা এক লক্ষ হবে, ‘অথবা’ তার চেয়েও বেশি হবে। এটি সংখ্যার আধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. সংখ্যা কত ছিল?

- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: তারা ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার।

- সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর মতে: ১ লক্ষ ৪০ হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি (৭০ হাজার)।

৩. হেদায়েত লাভ: ইউনুস (আ.)-এর ফিরে আসার পর এই বিশাল জনগোষ্ঠী ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহ তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ার সুখ-শান্তি ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

উপসংহার:

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইউনুস (আ.)-এর উম্মত ছিল অত্যন্ত বিশাল এবং তারা তওবা করে আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

১২১. প্রশ্ন: হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে কতদিন ছিলেন?

(كَمْ مَدَّةً مَكَثَ يُونسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَطْنِ الْخُوتِ?)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছের পেটে রাখার ঘটনাটি আল্লাহর এক অলৌকিক পরীক্ষা ছিল। তিনি কতদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন, সে সম্পর্কে কুরআনে নির্দিষ্ট কোনো সময় বলা হয়নি, তবে তাফসির ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়।

অবস্থানকাল (مُدَّةُ اللَّبْثِ):

তাকসীরুল মুনীর ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থে উল্লেখিত মতগুলো হলো:

১. তিন দিন: কাতাদা (রহ.)-সহ অনেক মুফাসসিরের মতে, তিনি ৩ দিন মাছের পেটে ছিলেন। এটিই অধিক প্রসিদ্ধ মত।
২. সাত দিন: জাফর সাদিক (রহ.) ও অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি ৭ দিন ছিলেন।
৩. চল্লিশ দিন: আবু মালিক (রহ.) বলেন, তিনি ৪০ দিন মাছের পেটে ছিলেন।
৪. এক বেলার কিছু অংশ: কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সকালে মাছের পেটে গিয়েছিলেন এবং বিকেলেই মুক্তি পেয়েছিলেন।

বিশ্লেষণ:

আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাছের পেটে জীবিত রেখেছিলেন এবং মাছকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁর হাড় না ভাঙে এবং গোশত না খায়। সেখানে তিনি لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমীন) দোয়াটি পাঠ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দেন।

উপসংহার:

সঠিক সময় আল্লাহই ভালো জানেন, তবে ৩ থেকে ৭ দিন হওয়ার মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

১২২. প্রশ্ন: "وان يونس لمن المرسلين ... الى يوم يبعثون" আয়াতগুলো থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

(مَاذَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ "وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতের ১৩৯ থেকে ১৪৪ নং আয়াতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা এবং তাঁর পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে মুমিনদের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও ফিকহী মাসআলা পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত শিক্ষা (الدُّرُوسُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. নবুওয়তের সত্যতা: হযরত ইউনুস (আ.) যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল ছিলেন, তা আয়াতে لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২. পলায়ন করা নবীর শান নয়: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল বা দাওয়াতের ময়দান ত্যাগ করা নবীদের জন্য শোভনীয় নয়। ইউনুস (আ.) অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়ায় তাঁকে ‘পলায়নকারী গোলাম’ বা الْأَيِّقُ বলা হয়েছে এবং এজন্য তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৩. লটারির বৈধতা: বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে বা অধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যখন অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন লটারি বা ‘কুরআ’ (الْقُرْعَةُ) ব্যবহার করা

শরিয়তে বৈধ। ইউনুস (আ.)-কে লটারির মাধ্যমেই জাহাজ থেকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল (فَسَاهَمَ - অতঃপর সে লটারি করল)।

৪. তাসবিহের শক্তি: বিপদের সময় আল্লাহর জিকির ও তাসবিহ পাঠ মানুষকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে। আল্লাহ বলেন:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلِابْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থ: “যদি সে তাসবিহ পাঠকারী না হতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত।”

৫. তওবার গুরুত্ব: মানুষ ভুল করলে সাথে সাথে তওবা করা উচিত। ইউনুস (আ.)-এর তওবা কবুল করে আল্লাহ তাঁকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

উপসংহার:

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয় যে, বিপদে একমাত্র আল্লাহই রক্ষাকারী এবং সুসময়ে আল্লাহকে স্মরণ করলে দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকেন।

১২৩. প্রশ্ন: ঈমান ও ইহসানের মধ্যে পার্থক্য কী? (مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আস-সাফফাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও অন্যান্য নবীদের ঘটনার শেষে বারবার বলা হয়েছে نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (আমি এভাবেই মুহসিন বা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দেই)। এখান থেকেই ঈমান ও ইহসানের আলোচনার সূত্রপাত।

ঈমান ও ইহসানের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

১. সংজ্ঞা ও মর্মার্থ:

- **ঈমান (الْإِيمَانُ):** ঈমান অর্থ বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে বিশ্বাস করা (তাসদীক), মুখে স্বীকার করা (ইকরার) এবং কাজে পরিণত করার (আমল) নাম ঈমান। অর্থাৎ, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া।

- **ইহসান (الإِحْسَانُ):** ইহসান অর্থ সুন্দরভাবে করা বা নিষ্ঠার সাথে করা। হাদিসে জিবরাঈলে রাসূল (সা.) বলেছেন: “ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি তা না পার, তবে (বিশ্বাস রাখবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।”

২. ব্যাপকতা (الْغُفُومُ وَالْخُصُوصُ):

- **ঈমান:** ঈমান হলো দ্বীনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি। জান্নাতে প্রবেশের জন্য ঈমান অপরিহার্য। প্রতিটি মুহসিনই মুমিন, কিন্তু প্রতিটি মুমিন মুহসিন নাও হতে পারে।
- **ইহসান:** ইহসান হলো ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর বা পূর্ণতা। যখন ঈমান ও আমল ইখলাসের (একনিষ্ঠতা) চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তা ইহসানে পরিণত হয়। এটি ‘খাস’ বা বিশেষ স্তরের মুমিনদের গুণ।

৩. প্রতিদান:

- মুমিন জান্নাতে যাবে, তবে ইহসানের স্তরে পৌঁছালে সে আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য, ভালোবাসা ও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন)।

উপসংহার:

সংক্ষেপে, ঈমান হলো স্বীকৃতির নাম, আর ইহসান হলো সেই স্বীকৃতির বাস্তব, একনিষ্ঠ ও সুন্দরতম রূপায়ণ।

سورة ص (সূরা সোয়াদ)

১২৪. প্রশ্ন: الحروف المقطعات কাকে বলে এবং আল কুরআনে তা উল্লেখের হেফত কী?

(مَا هِيَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتُ؟ وَمَا حِكْمَةُ ذِكْرِهَا فِي الْقُرْآنِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের প্রথম আয়াতটি শুরু হয়েছে ‘সোয়াদ’ (ص) দিয়ে। এটি হরুফে মুকাত্তা‘আতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে এমন বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।

হরুফে মুকাত্তা‘আত (الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتُ):

- সংজ্ঞা: ‘মুকাত্তা‘আত’ অর্থ বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড। পরিভাষায়, কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে একক বা যুক্ত বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেগুলোর বাহ্যিক কোনো অর্থ জানা যায় না, সেগুলোকে ‘হরুফে মুকাত্তা‘আত’ বলে। যেমন: আলিফ-লাম-মীম, হা-মীম, সোয়াদ ইত্যাদি।^২

উল্লেখের হেফত (حِكْمَةُ ذِكْرِهَا):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর প্রধান হেফতগুলো হলো:

১. কুরআনের মোজাজা বা চ্যালেঞ্জ: আরবরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গর্ব করত। আল্লাহ এই অক্ষরগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, কুরআন তোমাদের পরিচিত বর্ণমালা (আলিফ, বা, তা...) দিয়েই গঠিত। তবুও তোমরা এর মতো একটি সূরা তৈরি করতে পারছ না কেন? এটি প্রমাণ করে কুরআন মানুষের তৈরি নয়, বরং আল্লাহর কালাম।

২. মনোযোগ আকর্ষণ: আরবদের সাধারণ কথাবার্তা বা বক্তৃতায় এমন বিচ্ছিন্ন বর্ণের ব্যবহার ছিল না। তাই যখন রাসূল (সা.) তিলাওয়াতের শুরুতে এই অদ্ভুত শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন, তখন কাফেররা চমকে যেত এবং কৌতূহলবশত মনোযোগ দিয়ে শুনত।

৩. আল্লাহর গোপন রহস্য: এগুলোর সঠিক অর্থ কেবল আল্লাহই জানেন। এর মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর জ্ঞানের অসীমতা প্রমাণ করা হয়েছে।

উপসংহার:

এই বর্ণগুলো কুরআনের অলৌকিকত্ব ও গাম্ভীর্য প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম।

১২৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী "ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ"-এর "واو" কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত?

(الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ" لِأَيِّ شَيْءٍ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের প্রথম আয়াতে وَالْقُرْآنِ শব্দে শুরুতে একটি 'ওয়াও' (و) যুক্ত আছে। আরবি ব্যাকরণে 'ওয়াও' বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ওয়াও-এর ব্যবহার:

- কসম বা শপথ (لِلْقَسَمِ): মুফাসসিরগণের ঐকমত্যে এখানে 'ওয়াও' বর্ণটি কসম বা শপথের (Waw al-Qasam) জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

3

- অর্থ: “শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের।”
- উদ্দেশ্য: আল্লাহ তাআলা কুরআনের শপথ করে এর মর্যাদা ও সত্যতা প্রমাণ করেছেন। শপথের জওয়াব বা প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী এবং এই কুরআন আল্লাহর বাণী, যদিও কাফেররা তা অস্বীকার করে।

উপসংহার:

এখানে 'ওয়াও' দ্বারা মহান আল্লাহর কালামের পবিত্রতা ও গুরুত্বের কসম করা হয়েছে।

১২৬. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বানী "والقرآن ذي الذكر"-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।
("أَوْضَحْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ১ম আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের একটি বিশেষ গুণের শপথ করেছেন। 'যিয যিকর' (ذِي الذِّكْرِ) শব্দগুচ্ছের অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

4 وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ

- **শাব্দিক অর্থ:** “শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের” বা “শপথ সম্মানিত কুরআনের।”
- যিয যিকর (ذِي الذِّكْرِ)-এর ব্যাখ্যা:

তাফসীরুল মুনীর-এ এর তিনটি প্রধান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে:

১. উপদেশপূর্ণ: অর্থাৎ, এই কুরআন মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণকর পথের উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. সম্মানিত (الشَّرَفُ): ‘জিকর’ অর্থ সম্মান বা খ্যাতি। অর্থাৎ, এই কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। যারা একে ধারণ করবে, তারাও সম্মানিত হবে। যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন: وَلَقَوْمٌ لَّا يَذْكُرُونَ (নিশ্চয়ই এটি আপনার ও আপনার কওমের জন্য সম্মানের বস্তু)।

৩. বিবরণসমৃদ্ধ: এতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ও শরিয়তের বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

উপসংহার:

এই আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের মহত্ত্ব এবং মানবজীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে এর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২৭. প্রশ্ন: "والقرآن ذی الذکر" বাক্যটি ইরাবে কোন মহলে আছে?
(قَوْلُهُ تَعَالَى "وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ" مَا مَحَلُّهُ مِنَ الْإِعْرَابِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের আয়াতের তারকীব বা ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ (I'rab) অর্থ অনুধাবনে সহায়ক। সূরা সোয়াদের ১ম আয়াতে শপথের বাক্যটির ইরাব নিচে দেওয়া হলো।

ইরাবের মহল (مَحَلُّ الْإِعْرَابِ):

- ওয়াও (الْوَاوُ): এটি 'ওয়াও আল-কাসাম' (শপথের ওয়াও) এবং এটি হরফে জার (حرف الجر)।
- আল-কুরআন (الْقُرْآنُ): এটি 'মুকসাম বিহি' (যার শপথ করা হয়েছে) এবং মাজরুর (জেরবিশিষ্ট)।
- যিয যিকর (ذِي الذِّكْرِ):
 - যি (ذِي): এটি الْقُرْآن-এর সিফাত বা বিশেষণ। আসমায়ে সিভাহ (ছয়টি বিশেষ্য)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর জর বা জের হয়েছে 'ইয়া' (يَ) দ্বারা।
 - আয-যিকর (الذِّكْرِ): এটি মুজাফ ইলাইহি এবং মাজরুর।

জওয়াবে কসম: শপথের বাক্যের পর একটি জওয়াবে কসম (শপথের জবাব) থাকে, যা এখানে উহ্য (Mahzuf) আছে। তাফসিরকারকদের মতে, উহ্য বাক্যটি হলো: إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ (নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত) অথবা لَقَدْ صَدَقَ مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ সা. অবশ্যই সত্য বলেছেন)।

উপসংহার:

পুরো বাক্যটি শপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটি জুমলা কাসামিয়া।

১২৮. প্রশ্ন: "ص والقرآن ذي الذكر ... في الأسباب" আয়াতগুলো থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

(مَاذَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ "ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ... فِي الْأَسْبَابِ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ১ থেকে ১০ নং আয়াতে কাফেরদের মনমানসিকতা, তাদের অহংকার এবং কুরআনের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রাপ্ত শিক্ষা (الدُّرُوسُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. কুরআনের মর্যাদা: কুরআন হলো সম্মানের আকর ('যিয যিকর')। যে জাতি কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

২. অহংকার পতনের মূল: কাফেররা সত্য বোঝার পরও কেবল 'ইজ্জত' (অহমিকা) এবং 'শিয়াক' (বিরোধিতা)-এর কারণে ঈমান আনেনি। সত্য মেনে নেওয়ার পথে অহংকার বড় বাধা।

৩. তাওহীদে বিস্ময়: একজন মানুষ (মুহাম্মদ সা.) নবী হবেন এবং বহু মাবুদের পরিবর্তে এক আল্লাহর দাওয়াত দেবেন—এটা মক্কার কাফেরদের কাছে খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল। কিন্তু তাওহীদ বা একত্ববাদই হলো প্রব সত্য, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

৪. পূর্ববর্তীদের পরিণাম: নূহ, আদ, সামুদ ও ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জাতিগুলো নবীদের বিরোধিতা করে ধ্বংস হয়েছে। মক্কার কাফেরদের (এবং বর্তমানের বিরোধীদের) তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

৫. সবর ও সহনশীলতা: কাফেরদের বিদ্রোহের জবাবে নবীজিকে সবর করার এবং দাউদ (আ.)-এর মতো শক্তিশালী বান্দাদের স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের অহংকার ত্যাগ করে সত্য গ্রহণে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

১২৯. প্রশ্ন: আল্লাহর বাণী "بَلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?
(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "بَلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেররা কেন কুরআন ও নবীকে মানতে চায় না, তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ সূরা সোয়াদের ২য় আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

بَلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

অর্থ: “বরং কাফেররা অহমিকা ও বিরোধিতায় লিপ্ত।”

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

১. ইজ্জাতিন (عِزَّةٌ): এর অর্থ হলো মিথ্যা অহংকার, দম্ভ বা ঔদ্ধত্য। তারা মনে করে, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম অপমানিত হবে। তারা সত্যকে জেনেগুনেই প্রত্যাখ্যান করে কেবল জেদের বশবর্তী হয়ে।

২. শিকাক (شِقَاقٍ): এর অর্থ হলো বিরোধিতা বা হঠকারিতা। অর্থাৎ, তারা সত্য থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে নবীর সাথে শত্রুতা ও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে।

৩. আসল কারণ: তাদের ঈমান না আনার কারণ এই নয় যে কুরআনের দলিলে কোনো ঘাটতি আছে বা কুরআনে কোনো সন্দেহ আছে। বরং তাদের কুফরির আসল কারণ হলো তাদের অন্ধ অহংকার ও বিরোধিতার মনোভাব।

উপসংহার:

এই আয়াত দ্বারা কাফেরদের গোঁড়ামি ও সত্যবিমুখতার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

১৩০. প্রশ্ন: আল্লাহর বাণী "ان هذا لشيء عجاب" দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

(إِلَى مَاذَا أُشِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কার কাফেরদের বললেন, “তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলো”, তখন তারা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে কিছু কথা বলেছিল। সূরা সোয়াদের ৫ নং আয়াতে তাদের সেই বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইঙ্গিতকৃত বিষয় (المُشَارُ إِلَيْهِ):

কাফেররা বলেছিল: أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ (সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? নিশ্চয়ই এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার!)।

এখানে هَذَا (এটি) বা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

১. মূর্তিপূজার অভ্যাস: মক্কার মুশরিকরা ৩৬০টি মূর্তির পূজায় অভ্যস্ত ছিল। তারা মনে করত বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রয়োজন।

২. একত্ববাদে বিস্ময়: যখন নবীজি (সা.) বললেন, সব মূর্তিকে বাদ দিয়ে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, তখন তাদের কাছে এটি অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত মনে হলো। তারা ভাবল, এত বড় বিশ্বজগত এক আল্লাহ কীভাবে পরিচালনা করবেন? এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই তারা তাওহীদের দাওয়াতকে ‘উ‘জাব’ বা অতি বিস্ময়কর বলেছিল।

উপসংহার:

মূলত বহুত্ববাদ পরিত্যাগ করে একত্ববাদ গ্রহণ করার আহ্বানই তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল।

১৩১. প্রশ্ন: আল্লাহর বাণী "ان هذا لشيء يراد"-এর ব্যাখ্যা কর।
("أَوْضِحْ قَوْلَهُ تَعَالَى "إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ")

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার কাফের নেতারা সাধারণ মানুষকে নবীজির দাওয়াত থেকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন অপপ্রচার চালাত। সূরা সোয়াদের ৬ নং আয়াতে তাদের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

কাফের সর্দাররা জনগণকে বলত: “তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় অটল থাক। إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ (নিশ্চয়ই এটি এমন এক বিষয়, যার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে)।”

‘শাইউন ইউরাদু’-এর তাৎপর্য:

তাকসীরুল মুনীর ও অন্যান্য তাকসির অনুযায়ী এর দুটি প্রধান ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. নেতৃত্ব লাভের ষড়যন্ত্র: কাফের নেতারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়তের দাবির আড়ালে আসলে আমাদের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে চায়। ধর্ম তো কেবল একটি বাহানা, তার মূল উদ্দেশ্য (Murad) হলো ক্ষমতা দখল করা এবং আমাদের দাস বানানো।

২. পূর্বনির্ধারিত বিপদ: অথবা তারা বুঝিয়েছে যে, এটি (মুহাম্মদ সা.-এর আগমন) আমাদের ওপর আপতিত এমন এক মুসিবত বা বিপদ, যা আল্লাহ আমাদের জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। এখন ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত: প্রথম ব্যাখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ তারা নবীজির নিঃস্বার্থ দাওয়াতকে ‘ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র’ হিসেবে অপব্যখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল।

উপসংহার:

এটি ছিল নবীজির বিরুদ্ধে কাফের নেতাদের এক গভীর অপপ্রচার ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।

১৩২. প্রশ্ন: আল্লাহর বাণী "وَقَالَ الْكَافِرُونَ" আয়াতে যমীরের স্থলে ইসমে যাহের কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

(لَمْ يُضِعْ اسْمُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَقَالَ الْكَافِرُونَ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে وَقَالَ الْكَافِرُونَ (এবং তারা বলল) ব্যবহার না করে وَقَالُوا (এবং কাফেররা বলল) ব্যবহার করেছেন। আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রে (বালাগাত) একে বলা হয় ‘যমীর’ (সর্বনাম)-এর স্থলে ‘ইসমে যাহের’ (প্রকাশ্য বিশেষ্য) ব্যবহার করা।

ইসমে যাহের ব্যবহারের হেকমত:

১. কুফরির ওপর জোর দেওয়া (النَّسْجِيلُ عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ): আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তাদের এই জঘন্য উক্তিটি (জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলা) তাদের কুফরি বা অবিশ্বাসের কারণেই বের হয়েছে। তারা যে কাফের, তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. তিরস্কার ও নিন্দা (الذَّمُّ وَالنَّسْنِيبُ): তাদের পরিচয় গোপন না করে ‘কাফের’ নামে সম্বোধন করে তাদের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে।

৩. বিস্ময় প্রকাশ: সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এমন কথা বলতে পারে, তারা যে সাধারণ মানুষ নয় বরং চরম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের), তা প্রকাশ করা হয়েছে।

উপসংহার:

মূলত তাদের কুফরি সত্তাকে উন্মোচন করার জন্যই এখানে সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

১৩৩. প্রশ্ন: السحر অর্থ কী? সংক্ষেপে এর শরয়ী হুকুম বর্ণনা কর।
(مَا مَعْنَى السِّحْرِ؟ بَيِّنْ حُكْمَهُ بِإِخْتِصَارٍ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৪ নং আয়াতে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ‘জাদুকর’ (ساحر) বলে অপবাদ দিয়েছিল। এ থেকেই ‘সিহর’ বা জাদুর প্রসঙ্গ আসে।

‘সিহর’ বা জাদুর অর্থ (مَعْنَى السِّحْرِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** যা কিছুর কারণ সূক্ষ্ম বা গোপন থাকে (ما خفي سببه), তাকেই সিহর বা জাদু বলা হয়। এ কারণেই শেষ রাতকে ‘সাহরি’ বলা হয়, কারণ তখন অন্ধকার থাকে। এছাড়া ধোঁকা, ভেলকিবাজি ও চিত্তাকর্ষক কথাকেও সিহর বলা হয়।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শয়তান বা জিনদের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে কোনো অদ্ভুত কাজ দেখানো বা মানুষের ক্ষতি করাকে জাদু বলে।

শরয়ী হুকুম (الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ):

১. হারাম ও কবিরা গুনাহ: ইসলামে জাদু করা, জাদু শেখা এবং জাদু করানো সম্পূর্ণ হারাম। হাদিসে একে সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের (হিলাকুন) অন্যতম বলা হয়েছে।

২. কুফরি: অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, জাদুর সাথে যদি শয়তানের পূজা বা শিরক জড়িত থাকে, তবে জাদুকর কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (সুলাইমান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল, তারা মানুষকে জাদু শেখাত)।

৩. শাস্তি: ইসলামি রাষ্ট্রে জাদুকরের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, যদি সে তওবা না করে।

উপসংহার:

জাদু একটি জঘন্য অপরাধ, যা মানুষের ঈমান ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস করে।

১৩৪. প্রশ্ন: সিহর ও মুজিয়ার অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? (مَا مَعْنَى السِّحْرِ وَالْمُعْجَزَةِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেররা প্রায়ই নবীদের মুজিয়াকে ‘সিহর’ বা জাদু বলে আখ্যায়িত করত। অথচ এ দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

অর্থ:

- **মুজিয়া (الْمُعْجَزَةُ):** আল্লাহ তাআলা নবীদের নবুওয়ত প্রমাণের জন্য প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। যেমন— মুসা (আ.)-এর লাঠি সাপ হওয়া।
- **সিহর (السِّحْرُ):** শয়তানের সহায়তায় বা মন্ত্র পড়ে জাদুকর যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখায়।

পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	মুজিয়া (অলৌকিকত্ব)	সিহর (জাদু)
১. উৎস	আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি প্রদত্ত।	শয়তান বা জিনদের সহায়তায় অর্জিত।
২. মাধ্যম	কোনো মন্ত্র বা সাধনার প্রয়োজন নেই; নবীর ইচ্ছায় আল্লাহর কুদরতে ঘটে।	মন্ত্র, শিরকি কাজ ও পাপাচারের মাধ্যমে শিখতে হয়।
৩. উদ্দেশ্য	সত্য প্রচার ও মানুষকে হেদায়েত করা।	মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, ক্ষতি করা বা অর্থ উপার্জন।

৪. চ্যালেঞ্জ	এর মোকাবিলা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।	অন্য জাদুকর বা আমল দ্বারা এর মোকাবিলা বা বাতিল করা সম্ভব।
৫. ব্যক্তি	কেবল পবিত্র ও মাসুম নবীদের হাতে প্রকাশ পায়।	পাপাচারী ও অপবিত্র লোকের হাতে প্রকাশ পায়।

উপসংহার:

মুজিয়া হলো আল্লাহর কুদরত, আর জাদু হলো শয়তানি ভেলকিবাজি।

১৩৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "انزل عليه الذكر من بيننا" দ্বারা কী উদ্দেশ্য?
(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার কাফের সর্দারদের (যেমন আবু জাহেল, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা) অহংকার ছিল আকাশচুম্বী। তারা মেনে নিতে পারছিল না যে, তাদের মতো ধনাঢ্য ও প্রবীণ নেতাদের বাদ দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো এতিম ও সাধারণ ব্যক্তির ওপর কুরআন নাজিল হবে। সূরা সোয়াদের ৮ নং আয়াতে তাদের এই হিংসাত্মক মনোভাব ফুটে উঠেছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

তারা বিদ্রূপ করে বলত:

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

অর্থ: “আমাদের সবার মধ্য থেকে কি কেবল তার (মুহাম্মদের) ওপরই উপদেশবাণী (কুরআন) নাজিল করা হলো?”

উদ্দেশ্য:

১. ঈর্ষা ও হিংসা (الْحَسَدُ): তারা মনে করত নবুওয়ত পাওয়ার যোগ্য হলো গোত্রের সর্দাররা। তাদের বাদ দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে নির্বাচন করায় তারা হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরত। এটি ছিল তাদের অহংকারের বহিঃপ্রকাশ।

২. অস্বীকৃতি: তারা আল্লাহকে অস্বীকার করত না, কিন্তু আল্লাহর নির্বাচন বা চয়নকে (Selection) অস্বীকার করত। তারা ভাবত আল্লাহ কেন তাদের পরামর্শ নিলেন না!

৩. আল্লাহর জবাব: আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন, “বরং তারা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহে আছে... তারা কি তোমার রবের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক?” অর্থাৎ, নবুওয়ত আল্লাহর দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। এখানে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই।

উপসংহার:

এই উক্তিটি ছিল তাদের চরম অহংকার ও নবীজির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রমাণ।

১৩৬. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "ان هذا لشيء يراد"-এর নাহব অনুযায়ী তারকীব বিশ্লেষণ কর।

("هَاتِ التَّرْكِيْبَ النَّحْوِيَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৬ নং আয়াতে কাফের নেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক উক্তিটি ব্যাকরণগতভাবে বিশ্লেষণ করলে এর অর্থের দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়।

তারকীব (التَّرْكِيْبُ النَّحْوِيَّ):

বাক্য: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ

১. إِنَّ (ইন্না): হারফে মুশাব্বাহ বিল-ফে'ল (حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ)। এটি বাক্যে জোর বা তাকিদ সৃষ্টি করে। এটি তার ইসিমকে নসব (জবর) এবং খবরকে রফা (পেশ) দেয়।

২. هَذَا (হা-যা): ইসমে ইশারা (إِسْمٌ إِشَارَةٌ)। এটি 'ইন্না'-এর ইসিম হিসেবে মাহাল্লান মানসুব (নসবের অবস্থায় আছে)।

৩. ل (লাম): একে ‘লাম আল-মুয়াহলাকা’ (الْلَامُ الْمَرْحَلَةُ) বলা হয়। এটি মূলত জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ‘ইন্না’-এর খবরের শুরুতে আসে।

৪. شَيْءٌ (শাইউন): এটি ‘ইন্না’-এর খবর (خَبَرٌ إِنَّ)। এটি মারফু বা পেশবিশিষ্ট হয়েছে।

৫. يُرَادُ (ইউরাদু): এটি ফেলে মুজারে মাজহুল (কর্মবাচ্যের বর্তমানকাল)। এর মধ্যে ‘হুয়া’ (هُوَ) যমীর বা সর্বনামটি ‘নায়েবে ফায়েল’ হিসেবে উহ্য আছে, যা شَيْءٌ-এর দিকে ফিরেছে।

* পুরো জুমলা বা বাক্যটি (يُرَادُ) এখানে شَيْءٌ-এর সিফাত (গুণবাচক বাক্য) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থ: “নিশ্চয়ই এটি এমন এক বিষয়, যার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।”

১৩৭. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة" আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার কাফেররা তাওহীদের দাওয়াত শুনে বলেছিল যে, তারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে এমন কথা শোনেনি। সূরা সোয়াদের ৭ নং আয়াতে তাদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

কাফেররা বলেছিল: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ

অর্থ: “আমরা তো শেষ ধর্মাদর্শে এমন কথা শুনিনি।”

‘মিল্লাতে আখিরাহ’ (শেষ ধর্ম) দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

তাফসীরুল মুনীর ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

১. খ্রিস্টধর্ম (النَّصْرَانِيَّةُ): এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। কারণ ইসলামের আগমনের পূর্বে সর্বশেষ আসমানি ধর্ম ছিল খ্রিস্টধর্ম। খ্রিস্টানরা যেহেতু ত্রিত্ববাদে (তিনে এক) বিশ্বাসী ছিল এবং ঈসা (আ.)-এর পূজা করত, তাই মক্কার কাফেররা যুক্তি দেখাল যে, সর্বশেষ ধর্মেও তো এক আল্লাহর ইবাদতের কথা নেই।

২. কুরাইশদের ধর্ম: অথবা তারা তাদের নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মের কথা বুঝিয়েছে, যা তাদের কাছে শেষ বা চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিবেচিত ছিল।

‘বি-হাযা’ (بِهَذَا) বা ‘এমন কথা’ দ্বারা উদ্দেশ্য:

এর দ্বারা তাওহীদ বা একত্ববাদকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার বিষয়টি তাদের কাছে নতুন ও অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

১৩৮. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালায় বাণী "ذَا الْاَيِّدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ"-এর অর্থ কী?

(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "ذَا الْاَيِّدِ ۚ اِنَّهٗ اَوَّابٌ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে দুটি বিশেষ গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন: ‘যাল-আইদ’ এবং ‘আওয়াব’।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা:

১. যাল-আইদ (ذَا الْاَيِّدِ):

- শাব্দিক অর্থ: ‘আইদ’ (اَيِّدٍ) শব্দটি ‘ইয়াদুন’ (হাত)-এর বহুবচন অথবা শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অর্থ হলো—শক্তিশালী বা ক্ষমতার অধিকারী।
- তাফসীর: এখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর ‘ইবাদতের শক্তি’ এবং ‘রাজত্বের শক্তি’—উভয়টি বোঝানো হয়েছে। তিনি একদিন পর পর

রোজা রাখতেন এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাজে কাটাতেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী।

২. আওয়াব (أَوَابٌ):

- **শাব্দিক অর্থ:** যে বারবার ফিরে আসে।
- **তাফসীর:** এর অর্থ হলো—যিনি আল্লাহর দিকে রুজু করেন বা তওবা করেন। দাউদ (আ.) দিনের যেকোনো সময়, যেকোনো কাজে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজতেন এবং সামান্য ত্রুটিতেই আল্লাহর কাছে তওবা করে ফিরে আসতেন।

উপসংহার:

এই দুটি গুণের মাধ্যমে দাউদ (আ.)-এর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে।

১৩৯. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালা কীভাবে হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছেন?

(كَيْفَ أَيْدَى اللَّهُ تَعَالَى مُلْكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন একই সাথে নবী এবং বাদশা। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাজত্বকে বিশেষ কিছু নিয়ামত দ্বারা সুসংহত করেছিলেন। সূরা সোয়াদের ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ (আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম)।

রাজত্ব সুদৃঢ় করার মাধ্যমসমূহ:

১. প্রহরীর ব্যবস্থা: মুফাসসিরদের মতে, তাঁর পাহারার জন্য প্রতিদিন রাতে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার বনী ইসরাঈল প্রহরী নিযুক্ত থাকত।

২. শত্রু দমন: আল্লাহ তাঁকে জালুতকে হত্যা করার এবং শত্রুদের পরাজিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভয় ও ভক্তি (Haibah) সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

৩. নবুওয়ত ও হিকমত: নবুওয়তের পাশাপাশি তাঁকে ‘ফাসলুল খিতাব’ (মীমাংসাকারী বাগ্মীতা) এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

৪. প্রকৃতির আনুগত্য: পাহাড় ও পাখিদের তাঁর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল, যা তাঁর রাজকীয় শান ও আল্লাহর সমর্থনের প্রমাণ ছিল।

উপসংহার:

আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং প্রদত্ত হিকমতের কারণেই তাঁর রাজত্ব ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুশৃঙ্খল।

১৪০. প্রশ্ন: ফেরেশতারা প্রবেশ করলে দাউদ (আ.) ভয় পেলেন কেন? এবং "ان
لِمَاذَا فَرَعَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ دَخَلَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ؟ وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ
(تَعَالَى) "إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ"؟

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ২১-২২ নং আয়াতে দাউদ (আ.)-এর ইবাদতখানায় দুজন ব্যক্তির প্রবেশের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা মূলত মানুষের বেশে আগত ফেরেশতা ছিলেন।

ভয় পাওয়ার কারণ (سَبَبُ الْفَرَعِ):

দাউদ (আ.) তাদের দেখে ভীত হওয়ার কারণগুলো হলো:

১. অসময়ে আগমন: তারা এমন সময় প্রবেশ করেছিল, যা ছিল দাউদ (আ.)-এর নির্জন ইবাদতের সময়। তখন কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

২. প্রবেশের পদ্ধতি: তারা দরজা দিয়ে আসেনি, বরং প্রাচীর টপকে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

৩. হত্যার আশঙ্কা: রাজকীয় প্রহরা এড়িয়ে এভাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে আসা দেখে তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো তারা শত্রু এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য এসেছে।

‘তাসাওয়ারুল মেহরাব’-এর অর্থ:

আয়াতে বলা হয়েছে: اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

- তাসাওয়ারুল (تَسَوَّرُوا): শব্দটি ‘সুর’ (প্রাচীর) থেকে এসেছে। অর্থ হলো—তারা প্রাচীর বা দেয়াল টপকে ভেতরে আসল।
- আল-মেহরাব (الْمِحْرَاب): এর অর্থ হলো ইবাদতখানা বা খাস কামরা। প্রাসাদের যে অংশে তিনি নির্জনে ইবাদত করতেন, তাকেই মেহরাব বলা হয়েছে।

উপসংহার:

মূলত পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের বিবাদী সেজে পাঠিয়েছিলেন, আর তাদের অস্বাভাবিক আগমনে দাউদ (আ.) মানবীয় ফিতরাত অনুযায়ী ভয় পেয়েছিলেন।

১৪১. প্রশ্ন: আয়াতে "شَدَدْنَا وَلَا تَشْطُطْ"-এর কয়টি কেরাত রয়েছে?
(كَمْ قِرَاءَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ... وَلَا تَشْطُطْ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ২২ নং আয়াতে দুই বিবাদমান ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে বিচার চাইতে এসে বলেছিল, “আমাদের সঠিক পথ দেখান এবং অবিচার করবেন না।” এখানে وَلَا تَشْطُطْ শব্দটির পঠন বা কিরাত নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে।

কিরাত সংখ্যা ও বিশ্লেষণ:

তাফসীর ও কিরাত শাস্ত্রের গ্রন্থ অনুযায়ী, لَا تُشْطِطُ শব্দটিতে প্রধানত দুটি কিরাত বা পঠনরীতি প্রচলিত আছে:

১. তুশত্বিত্ব (تُشْطِطُ): এটি ইমাম আসিম, হামযা ও কিসাঈ (রহ.)-এর কিরাত। এটি ‘বাব-ই ইফআল’ (أَشْطَطَ) থেকে এসেছে।

২. তাশত্বুত (تَشْطِطُ): এটি অন্যান্য কারীদের (যেমন ইবনে কাসীর ও নাফে) কিরাত। এটি ‘বাব-ই নাসারা’ (شَطَطَ) থেকে এসেছে।

অর্থের ভিন্নতা:

উভয় কিরাতের অর্থ প্রায় অভিন্ন। এর অর্থ হলো—“সীমালঙ্ঘন করবেন না” বা “অবিচার করবেন না” (Do not be unjust)। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়াকে আরবিতে ‘শাত্বাত্ব’ বলা হয়।

উপসংহার:

শব্দগঠনে ভিন্নতা থাকলেও উভয় কিরাতের মর্মার্থ একই, অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রার্থনা করা।

১৪২. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালা বাণী "لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ" -এর ব্যাখ্যা কর।

("أَوْضَحْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ "لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ২৪ নং আয়াতে হযরত দাউদ (আ.) দুই বিবাদমান ব্যক্তির অভিযোগ শোনার পর যে রায় দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ছিল মূলত আল্লাহ কর্তৃক দাউদ (আ.)-এর একটি পরীক্ষা।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

দাউদ (আ.) বললেন:

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ

অর্থ: “সে তোমার দুম্বটিকে নিজের দুম্বগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে তোমার ওপর অবশ্যই জুলুম করেছে।”

তাকসীরুল মুনীর-এর আলোকে বিশ্লেষণ:

১. ঘটনার প্রেক্ষাপট: দুই ভাই বা বিবাদী দাউদ (আ.)-এর কাছে এল। একজনের ৯৯টি দুম্বা ছিল, আরেকজনের ছিল মাত্র ১টি। যার ৯৯টি ছিল, সে তার ভাইয়ের ওই ১টি দুম্বাও নিয়ে নিতে চাইল যাতে তার ১০০টি পূর্ণ হয়।

২. রায়ের তাৎপর্য: দাউদ (আ.) অভিযোগকারী (যার ১টি দুম্বা ছিল)-এর কথা শুনেই তাৎক্ষণিক মন্তব্য করলেন যে, ধনী ভাইটি গরিব ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে। কারণ, প্রাচুর্য থাকার পরও অন্যের সামান্য সম্বলটুকু গ্রাস করতে চাওয়া চরম অবিচার।

৩. শিক্ষণীয় দিক: এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ দাউদ (আ.)-কে শিক্ষা দিলেন যে, বিচারকের উচিত বিবাদী পক্ষের (দ্বিতীয় পক্ষের) কথা না শুনেই একতরফা রায় না দেওয়া। দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন এটি একটি পরীক্ষা ছিল, তাই তিনি সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং তওবা করলেন।

উপসংহার:

আয়াতটি দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের চিত্র এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরে।

১৪৩. প্রশ্ন: শয়তানদের অধীনস্থ করার উপকারিতা কী?

(مَا الْفَائِدَةُ فِي تَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে এমন রাজত্ব দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দেননি। তিনি জিন ও শয়তানদের সুলাইমান (আ.)-এর অধীনস্থ বা বশীভূত করে দিয়েছিলেন। সূরা সোয়াদের ৩৭-৩৮ নং আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে।

শয়তানদের অধীনস্থ করার উপকারিতা (فَوَائِدُ التَّسْخِيرِ):

১. কঠিন নির্মাণকাজ (الْبِنَاءُ): সুলাইমান (আ.) জিন ও শয়তানদের দিয়ে বিশাল প্রাসাদ, দুর্গ, মেহরাব, ভাস্কর্য এবং হাউজের মতো বড় বড় পাত্র তৈরি করাতেন। মানুষের পক্ষে যেসব ভারী পাথর বা স্তম্ভ বহন করা সম্ভব ছিল না, শক্তিশালী জিনেরা তা সহজেই করত। আয়াতে এদের كُلُّ بَنَاءٍ (প্রত্যেক নির্মাণশিল্পী) বলা হয়েছে।

২. সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ (الْغَوْصُ): একদল শয়তানকে তিনি ডুবুরি হিসেবে ব্যবহার করতেন (وَعَوَّاصٍ)। তারা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মুক্তা, প্রবাল এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্নভাণ্ডার তুলে আনত, যা মানুষের সাধের বাইরে ছিল।

৩. ফিতনা থেকে সুরক্ষা: অবাধ্য ও দুষ্ট জিনদের তিনি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন, যাতে তারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে না পারে। এতে মানুষ তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকত।

উপসংহার:

জিন ও শয়তানদের এই বশ্যতা ছিল সুলাইমান (আ.)-এর নবুওয়ত ও রাজত্বের এক বিশাল মোজেজা, যা দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল।

১৪৪. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "واخرين مقرنين في الاصفاد" দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বে অনুগত জিনদের পাশাপাশি বিদ্রোহী বা অবাধ্য জিনদের জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। সূরা সোয়াদের ৩৮ নং আয়াতে তাদের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

অর্থ: “এবং অন্য একদলকে (শয়তানকে) শিকলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাখা হতো।”

ব্যাখ্যা:

১. মুকাররানীন (مُقَرَّنِينَ): এর অর্থ হলো শিকল দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ বা হাত-পা একসাথে বাঁধা। বিদ্রোহী ও দুষ্ট প্রকৃতির জিন বা শয়তানদের এভাবে বন্দি করে রাখা হতো।

২. আসফাদ (الْأَصْفَادِ): এটি ‘সাফদুন’ (صَفْدٌ)-এর বহুবচন, অর্থ—বেড়ি, শিকল বা হাতকড়া।

৩. উদ্দেশ্য:

- **শাস্তি:** যারা সুলাইমান (আ.)-এর আদেশ অমান্য করত বা কাজে ফাঁকি দিত, তাদের শাস্তি হিসেবে এভাবে বন্দি রাখা হতো।
- **নিরাপত্তা:** এরা যেন পালিয়ে গিয়ে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে বা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য তাদের আটকে রাখা হতো।
- **ক্ষমতার প্রদর্শনী:** অবাধ্য শয়তানদের এভাবে বেঁধে রাখা প্রমাণ করত যে, সুলাইমান (আ.)-এর ক্ষমতা কেবল ভক্তদের ওপর নয়, বরং অদৃশ্য ও বিদ্রোহী শক্তির ওপরও প্রবল ছিল।

উপসংহার:

এর দ্বারা অবাধ্য জিনদের নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তির কঠোর ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৪৫. প্রশ্ন: আয়াত "إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشَى الصَّافِنَاتُ الْجِدَادُ" সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি উল্লেখ কর।

("أَذْكُرِ الْوَاقِعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْآيَةِ" إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشَى الصَّافِنَاتُ الْجِدَادُ)
উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৩১ নং আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর একটি বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা তাঁর আল্লাহভীতি ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘটনার বিবরণ (تَفْصِيلُ الْوَاقِعَةِ):

তাকসীরুল মুনীর-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি নিম্নরূপ:

১. ঘোড়া পরিদর্শন: হযরত সুলাইমান (আ.) জিহাদের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী ও উন্নত জাতের ঘোড়া পছন্দ করতেন। একদিন আসরের নামাজের সময় বা দিনের শেষভাগে তাঁর সামনে তাঁর প্রশিক্ষিত ঘোড়াগুলো প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তিনি ঘোড়া দেখতে দেখতে এতই মশগুল হয়ে গেলেন যে, আসরের নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল (অথবা তাঁর নিয়মিত জিকির-আযকারের সময় চলে গেল)।

২. সূর্যর অস্তগমন: যখন তিনি খেয়াল করলেন যে সূর্য ডুবে গেছে এবং তাঁর নামাজ বা ইবাদত কাজা হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

৩. ঘোড়া ফেরত আনা: তিনি নির্দেশ দিলেন, “এগুলোকে (ঘোড়াগুলোকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।” (رُدُّوْهَا عَلَيَّ)।

৪. আল্লাহর জন্য ত্যাগ: এই ঘোড়াগুলোই যেহেতু তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, তাই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেগুলোকে কুরবানি করার বা আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

উপসংহার:

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর হুকুমের সামনে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুও মুমিনের কাছে তুচ্ছ।

১৪৬. প্রশ্ন: আয়াত "فَطْفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ" এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।
("أَوْضَحَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "فَطْفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সুলাইমান (আ.) ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনার পর কী করেছিলেন, তা সূরা সোয়াদের ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَطْفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

অর্থ: “অতঃপর তিনি সেগুলোর পা ও গলায় হাত বুলিয়ে (কাটতে) শুরু করলেন।”

তাকসীরুল মুনীর-এর আলোকে বিশ্লেষণ:

১. ‘মাসহ’ (مَسْحًا)-এর অর্থ: আভিধানিক অর্থে ‘মাসহ’ মানে হাত বুলানো বা মুছে দেওয়া। তবে তাকসিরবিদদের মতে, এখানে এর দ্বারা ‘তরবারি চালানো’ বা ‘জবেহ করা’ বোঝানো হয়েছে।

২. কুরবানি করা: সুলাইমান (আ.) ঘোড়াগুলোর পা (সুক) এবং গলা (আ‘নাক) তরবারি দিয়ে কেটে আল্লাহর নামে কুরবানি করে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই সম্পদ তাঁকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করেছে, তাই কাফফারা হিসেবে তিনি এগুলো উৎসর্গ করলেন।

৩. ভিন্ন মত: কোনো কোনো মুফাসসির (যেমন তাবারী) বলেন, তিনি ঘোড়াগুলোকে আদর করে তাদের পা ও গলার ধুলোবালি মুছে দিয়েছিলেন। তবে জমহুর মুফাসসিরদের মতে, ‘ঘোড়া কুরবানি দেওয়া’র মতটিই এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে (আল্লাহর দিকে ফিরে আসা বা ‘আওয়াব’ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে) বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার:

সুলাইমান (আ.) আল্লাহর ভালোবাসায় নিজের প্রিয় সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে ত্যাগের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন।

১৪৭. প্রশ্ন: "ان عرض عليه" বাক্যটি নাহব অনুযায়ী কী অবস্থায়?
(مَاذَا وَقَعَ فِي التَّرَكِيبِ "إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ"?)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৩১ নং আয়াতের শুরুতে عَلَيْهِ إِذْ عَرَضَ (যখন তার সামনে পেশ করা হলো...) বাক্যাংশটি রয়েছে। এর ব্যাকরণগত অবস্থান বা তারকীব আয়াতের অর্থ স্পষ্ট করে।

নাহবী অবস্থান (الْمَوْقِعُ الْإِعْرَابِيُّ):

- ইয (إِذْ): এটি 'যরফে যামান' (ظَرْفُ زَمَانٍ) বা সময়বাচক ক্রিয়াবিশেষণ। এটি মাফ'উলে ফিহি (مَفْعُولٌ فِيهِ) হিসেবে মানসুব (নসবের অবস্থায়) আছে।
- মুতাআল্লিক (সম্পৃক্ততা): এই 'ইয' শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়া বা 'ফেল'-এর সাথে সম্পৃক্ত। সেই উহ্য ক্রিয়াটি হলো 'উযকুর' (أَذْكُرُ)।
 - পূর্ণ বাক্য: إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ... (أَذْكُرُ)...
 - অর্থ: "(হে নবী! আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা) যখন তার সামনে পেশ করা হয়েছিল..."
- জুমলা: عَرَضَ عَلَيْهِ... বাক্যটি 'ইয'-এর পর আসায় এটি মুজাফ ইলাইহি হিসেবে মাহাল্লান মাজরুর (জেরের অবস্থায়) হয়েছে।

উপসংহার:

إِذْ শব্দটি এখানে অতীত কালের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উহ্য ক্রিয়ার কর্ম (সময়বাচক) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪৮. প্রশ্ন: ইবলিস কি ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? না হলে আয়াতে "الْأَبْلِسُ" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

هَلْ كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمَا مَعْنَى الْإِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ (تَعَالَى) "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ"?

উত্তর:

ভূমিকা:

ফেরেশতাদের সিজদার হুকুম দেওয়ার সময় ইবলিস সিজদা করেনি। কুরআনে বলা হয়েছে, “সব ফেরেশতা সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া।” এতে প্রশ্ন জাগে, ইবলিস কি ফেরেশতা ছিল?

ইবলিসের পরিচয়:

- কুরআনের ফয়সালা: সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

অর্থ: “সে (ইবলিস) ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত, অতঃপর সে তার রবের আদেশ অমান্য করল।”

ফেরেশতারা নূরের তৈরি এবং তারা কখনো পাপ করে না। আর ইবলিস আগুনের তৈরি এবং সে পাপ করেছে। সুতরাং সে ফেরেশতা ছিল না।

‘ইল্লা ইবলিস’ (إِلَّا إِبْلِيسَ)-এর ব্যাখ্যা:

যদি সে ফেরেশতা না হয়, তবে ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে তাকে ‘ইল্লা’ (ব্যতীত) দিয়ে কেন আলাদা করা হলো?

- ইস্তিসনা মুনকাতি (إِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ): ব্যাকরণবিদ ও মুফাসসিরদের মতে, এখানে ‘ইস্তিসনা’ (ব্যতিক্রম) হলো ‘মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে (ইবলিস), সে মূল দলের (ফেরেশতাদের) জাতিভুক্ত নয়।

- উদাহরণ: “সারা গ্রামবাসী এসেছে, কিন্তু একটি কুকুর আসেনি।” এখানে কুকুর গ্রামবাসী নয়, তবুও আগমনকারীদের দল থেকে তাকে আলাদা করা হয়েছে।
- ইবলিস ইবাদত ও মর্যাদার কারণে ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করত এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো। তাই বাহ্যিক উপস্থিতির কারণে তাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিগত কারণে নয়।

উপসংহার:

ইবলিস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেরেশতাদের সমাবেশে উপস্থিত থাকার কারণে ‘ইস্তিসনা’ বা ব্যতিক্রমের মাধ্যমে তার অবাধ্যতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৯. প্রশ্ন: ابليس শব্দের অর্থ কী এবং সে কেন আদম (আ)-কে সেজদা করেনি?
(مَا مَعْنَى إِبْلِيسَ؟ وَلِمَاذَا لَمْ يَسْجُدْ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ফেরেশতাদের সাথে ইবলিসও আল্লাহর নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু যখন আদম (আ)-কে সিজদা করার হুকুম দেওয়া হলো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। এই অবাধ্যতার কারণেই তার নাম হয় ‘ইবলিস’।

ইবলিস শব্দের অর্থ (مَعْنَى إِبْلِيسَ):

- **মূলধাতু:** শব্দটি আরবি ‘ইবলাস’ (إِبْلَاسُ) থেকে নির্গত।
- **অর্থ:** এর অর্থ হলো হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া। যেহেতু সে আল্লাহর রহমত থেকে চিরদিনের জন্য নিরাশ ও বঞ্চিত হয়েছে, তাই তাকে ‘ইবলিস’ বলা হয়।

সিজদা না করার কারণ (سَبَبُ عَدَمِ السُّجُودِ):

ইবলিস আদম (আ)-কে সিজদা না করার পেছনে দুটি প্রধান কারণ ছিল:

১. অহংকার (الْكِبْرُ): সে নিজেকে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। সে বলেছিল, أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (আমি তার চেয়ে উত্তম)।

২. ভুল যুক্তি (الْقِيَاسُ الْفَاسِدُ): সে যুক্তি দেখাল, خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে)। আগুনের ধর্ম উর্ধ্বে ওঠা, আর মাটির ধর্ম নিচে থাকা। তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে নিকৃষ্টকে সিজদা করা তার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছে। এই অহংকার ও হিংসাই তাকে ধ্বংস করেছে।

উপসংহার:

আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের যুক্তি দাঁড় করানোই ছিল ইবলিসের পতন ও অভিশপ্ত হওয়ার মূল কারণ।

১৫০. প্রশ্ন: غَيْرِ اللَّهِ-কে সেজদা করার অর্থ কী? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

(مَا مَعْنَى السُّجُودِ لغيرِ اللَّهِ؟ بَيِّنْ بِالْوُضُوحِ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সোয়াদের ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল।” এখানে আদম (আ.)-কে সিজদা করা হয়েছিল, যিনি আল্লাহ নন। এর ব্যাখ্যা ও শরিয়তের বিধান স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি।

গায়রুল্লাহকে সিজদার অর্থ ও স্বরূপ:

ফেরেশতারা আদম (আ.)-কে যে সিজদা করেছিলেন, মুফাসসিরদের মতে তার দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. সিজদায়ে তাহিয়াহ (السُّجُودُ التَّحِيَّةُ): এটি ছিল সম্মানসূচক বা অভিবাদনমূলক সিজদা। এটি সিজদায়ে ইবাদত (উপাসনার সিজদা) ছিল না। পূর্ববর্তী শরিয়তগুলোতে (যেমন ইউসুফ আ.-এর সময়) বড়দের সম্মান জানাতে সিজদা করা বৈধ ছিল। আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. কেবলা হিসেবে সিজদা: কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতারা মূলত আল্লাহকেই সিজদা করেছিলেন, কিন্তু আদম (আ.) ছিলেন তাদের কেবলা বা অভিমুখ (যেমন আমরা কাবার দিকে ফিরে আল্লাহকে সিজদা করি)। তবে প্রথম মতটিই (সম্মানসূচক) অধিক প্রসিদ্ধ।

বর্তমান বিধান:

আমাদের শরিয়তে (ইসলামে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা—চাই তা সম্মানের জন্যই হোক—সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যদি আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে।” (তিরমিযী)।

উপসংহার:

আদম (আ.)-এর ক্ষেত্রে এটি ছিল আল্লাহর নির্দেশে সম্মান প্রদর্শন, কিন্তু ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।
